প্রকাশনার ৯৪ বছর
ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ২১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ১৮ সাবান, ১৪৩৮ হিজরি | ১৫ হিজরত, ১৩৯৬ হি. শা. | ১৫ মে, ২০১৭ ঈসাব্দ

গত ২৩ মার্চ ২০১৭
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা'র উদ্যোগে দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে
মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস সফলভাবে সমাপ্ত হয়

দোয়ার আবেদন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের একজন নবীন মোবাল্লেগ জনাব মোস্তাফিজুর রহমান জামেয়া থেকে পাশ করে গত দুই বছর যাবত ময়মনসিংহের সোহাগী জামাতে মুরুব্বী হিসেবে কাজ করছিলেন। সোহাগী জামাত মূলত ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার সরিষা ইউনিয়নের কানপুর গ্রামে অবস্থিত।

গত ৮ই মে, সোমবার এশা'র নামাযের পূর্বক্ষণে ৩-৪ জন যুবক আমাদের মুরুব্বী জনাব মোস্তাফিজুর রহমানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। এর পূর্বেও গত ১৩ই মার্চ একদল মোল্লা এসেছিল তাকে এবং ওখানকার আহমদীদের ওপর আক্রমণ চালাতে, কিন্তু স্থানীয় গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের প্রতিরোধে তারা একাজে ব্যর্থ হয়। এরই রেশ ধরে গত কিছুদিন ধরে গ্রুপে গ্রুপে মোল্লারা আমাদের জামাত বিষয়ে জানতে মসজিদে আসছিল।

৮ই মে, সোমবার মুসল্লি-বেশে দুর্বৃত্তরা মসজিদে আসে। তখন তিনি তাদেরকে মুসল্লি মনে করে দরজা খুলে দেন। এরপর তিনি মসজিদের আলো জ্বালাতে গেলে পেছন দিক থেকে তারা কোপানো শুরু করে। কোন রকমে তিনি সেখান থেকে দৌড়ে পাশের একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে, কিন্তু সে বাড়িতে কোন লোকজন উপস্থিত না থাকায় আক্রমণকারীরা সেখানেও ঢুকে অন্ধকারের মধ্যে তাকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে।

এসময় তাদেরই একজনের কোপে আরেকজন দুর্বৃত্ত আহত হয়ে যায়। অপরদিকে তার চিৎকার শুনে আশ-পাশ থেকে লোকজন ছুটে আসে এবং আহত দুর্বৃত্তকে ধরে ফেলে। এরই মধ্যে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয় এবং তাদের সহযোগিতায় তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বলে। আল্লাহ তা'লার অশেষ ফযলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমানে তিনি আই.সি.ইউ বিভাগে রয়েছেন।

তার আশু আরোগ্যের জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর কাছে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন জানানো হলো।

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official
Commercial/Industrial
Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া খেলাফত জগতময় কল্যাণ বিতরণ ধারা

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্মিলিত ভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সর্বজন মান্য ইমাম রূপে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করে ইসলামের কল্যাণ বিতরণ ধারাকে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সচল রেখেছিলেন। আধ্যাত্মিক এই ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, মুসলিম উম্মাহ কখনই নেতৃত্বহীন থাকতে পারে না বরং সকল প্রকার কল্যাণ ও উন্নতির চাবিকাঠি এই খেলাফতের মাঝেই নিহিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম জাতির। মাত্র তিরিশ বছর পেরোতেই তারা এই মহা-কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল।

তবে মহানবী (সা.)-এর শুভ সংবাদ অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে এই ঐশী-কল্যাণের বিতরণ-ধারা পুণরায় সংস্থাপিত হয়েছে। আর এই কল্যাণময় ধারা কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবার নয়।

আহমদীয়া খেলাফত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বিশেষ আশিস প্রাপ্ত সেই খেলাফত, যার ধারাবাহিকতায় আজ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর পঞ্চম খেলাফতকাল চলছে। তাঁরই খেলাফতকালে শতবর্ষ উদযাপন করার তৌফিক খোদা তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের ছায়া সর্বদা আহমদীয়া খেলাফতের ওপর পরিব্যপ্ত।

তৌহীদের ধ্বনী উচ্চকিত করতে আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে এ জামা'ত প্রায় প্রতিদিনই একটি করে মসজিদ লাভ করছে। মহানবী (সা.)-এর মিশন একদিকে রোম আর অন্যদিকে পারস্য পর্যন্ত এক খোদার বাণী পৌঁছাচ্ছে এবং কোটি কোটি হৃদয় আজ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কলেমা উচ্চারণ করে ইসলামের পতাকা তলে আশ্রয় নিচ্ছে। সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তৌহীদ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।

এই খেলাফতের অধীনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শত শত মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি দুর্দশাগ্রস্ত কোটি কোটি লোকদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও করছে। সেবার কোন ক্ষেত্র দৃষ্টিতে এলেই নির্দ্বিধায় ঝাপিয়ে পড়ছে। এ সেবা আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ ও খড়া-কবলিত এলাকা হোক, গুজরাট, জাপান বা নেপালের ভূমিকম্প প্রপীড়িত লোকদের প্রয়োজন দেখা দিক, পাকিস্তানে প্লাবনে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যের প্রশ্ন আসুক, বাংলাদেশে সিডর কবলিত এলাকার কথা আসুক, এমনকি উন্নত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রেও ভূমিকম্প বা অকস্মাৎ বন্যায় আক্রান্ত বাস্তুহারা লোকদের খাবার পৌঁছানোর সুযোগ আসুক, জামা'তে আহমদীয়ার স্বেচ্ছা-সেবীগণ সেবার ঝান্ডা সমুন্নত রেখে অবনত মস্তকে খলীফার নির্দেশে সর্বান্তকরণে সেবায় নিয়োজিত থাকে।

মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ-নবীর অনুসারী মুসলমানরা সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের শিকার হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। সবাই যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে। স্বার্থের দ্বন্দে সবাই রণসাজে সজ্জিত। যে কোন সময় বিপর্যয় ঘটতে পারে, তাই সময় থাকতে এ বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের রাস্তা বের করা উচিত। সমস্ত মুসলিম আজ শতধা বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ছে, আর মুসলমানদের এই অনৈক্যের কারণেই তারা ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে অহরহ পরস্পরের রক্তপাত ঘটাচ্ছে। বিপর্যয় থেকে সারা পৃথিবীর রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র রাস্তা খোলা আছে, আর তা হলো খোদা-প্রদত্ত নেতার আনুগত্য করা। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম বিশ্ব-নেতৃবর্গকে আর বড় বড় সব পার্লামেন্ট ভবনে বিরামহীনভাবে সেই আহ্বানই করে চলছেন। সমগ্র মুসলিম-দেশ যদি আজ এক নেতার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলত, তাহলে এতসব দুর্যোগ হানা দিত না।

এই ঐশী-খেলাফতের নেতৃত্বে যারা আজ নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন, তারা অনেক সৌভাগ্যবান। তারা খোদার আদেশ অনুযায়ী এক ইমামের আশ্রয়ে আছেন এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ এক দূর্গে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ! এ কথা দাবীর সাথেই বলতে পারি, সমগ্র পৃথিবীতে যে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে, তা থেকে খোদা তা'লা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদেরকে মুক্ত রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও রাখবেন, ইনশাআল্লাহ্। মহান খলীফার আশিসপূর্ণ দোয়ার ফলে খোদা তা'লা সকল আহমদীর হেফাযত করছেন।

মর্যাদাপূর্ণ- এ ঐশী-খিলাফতের আশ্রয়ে আমরা আছি, তাই আমাদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আজ আমরা পঞ্চম খলীফা (আই)-এর দয়ার চাদরে আবৃত। আমাদের উচিত, খেলাফতের প্রতি আনুগত্যের মান পূর্বের চেয়ে আরো অনেক বৃদ্ধি করা। ২০০৮ সালে খিলাফত শতবর্ষ জুবিলীর উৎসবে বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) যে অঙ্গীকার আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, তার কতটুকু আমরা বাস্তবায়ন করছি-তা খতিয়ে দেখা দরকার। সেদিন আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম **"আমরা ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রসার আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য জীবনের শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবো। এই পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে সর্বদা আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এর জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করে রাখবো এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে সমুন্নত রাখবো। খেলাফত-ব্যবস্থার সুরক্ষা ও এর দৃঢ়তার লক্ষ্যে আমরা জীবনের শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম চেষ্টা করে যাবো এবং বংশ পরম্পরায় নিজ সন্তান-সন্ততিকে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ও এর কল্যাণরাজী অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকার নসীহত করে যাবো, যেন কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া খেলাফত সুরক্ষিত থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা যেন অন্য সব পতাকার উর্ধ্বে থাকে"।**

'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের' ধারায় পুণঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই মাসটিতে আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত, যুগ-খলীফার সাথে কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালনে আমরা কতটুকু তৎপর রয়েছি? আমাদের সবাইকে খোদা তা'লা যুগ-খলীফার সকল নির্দেশ যথার্থরূপে পালনের মাধ্যমে স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্রে

১৫ মে, ২০১৭

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ অক্টোবর, ২০১৬ **জুমুআর খুতবা** ৯

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ১৮

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ২৬
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

খিলাফতে আহমদীয়া: প্রতিশ্রুত ঐশী খিলাফত ব্যাধিমুক্তির নিশ্চিত নিরাপদ ব্যবস্থা ২৯
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা ৩৩
মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

কলমের জিহাদ ৩৫
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

শবে বরাত ৩৭
মাওলানা সালেহ্ আহমদ

রোযা প্রসঙ্গ ৪০
মাহমুদ আহমদ সুমন

সংবাদ ৪৩

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন ৪৮

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ
اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ
مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰۷﴾

১০৭। যার অন্তর ঈমান এনে পরিতৃপ্ত হওয়া সত্ত্বেও [ক]তাকে (অসহনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে) অস্বীকারে বাধ্য করা হয়েছে একমাত্র এমন ব্যক্তি ছাড়া যারা তাদের ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করে আর তাদের হৃদয় অস্বীকারে সন্তুষ্ট[১৫৭৯] হয় তাদের জন্য আল্লাহর ক্রোধ অবধারিত। আর তাদের জন্য এক মহা আযাব নির্ধারিত।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮। [ক]এর কারণ হলো, তারা পরকালের তুলনায় ইহকালকে (প্রাধান্য দিয়ে) ভালো বেসেছে এবং (তাছাড়া) আল্লাহ অস্বীকারকারীদের কখনো হেদায়াত দেন না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۰۹﴾

১০৯। [খ]এদেরই হৃদয়ে, কানে ও চোখে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। আর এরাই উদাসীন।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

১১০। নিঃসন্দেহে [গ]পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا
فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ
مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۱﴾ ع ۱۴

১১১। আর [ঘ]তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের জন্য, যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করেছে, জিহাদ করেছে[১৫৮০] এবং ধৈর্য ধরেছে, তোমার প্রভু-প্রতিপালক এরপরও নিশ্চয় তাদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

১৫৭৯। যে ব্যক্তি কঠিনতম পরীক্ষায় পড়ে এমন কথা বলে যা বাহ্যত কুফরী, অথচ অভ্যন্তরীণভাবে সে হয়তো ইসলামের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এরূপ ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'লা কিরূপ ব্যবহার করবেন এ বিষয়ে বর্তমান আয়াত নীরব। এতে বুঝা যায়, এরূপ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার স্থগিত রাখা হয়েছে এবং এদের ভবিষ্যত আচার-আচরণে নির্ধারিত হবে এরা আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে কিরূপ ব্যবহার পাবে।

১৫৮০। যেখানে ১০৯, ১১০ আয়াতে সেসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা মুর্তাদ (কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকারী) হয়ে যায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের শত্রুদের দলে যোগদান করে, সেখানে বর্তমান আয়াতে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যাদের সম্পর্কে বিচার স্থগিত রাখা হয়েছে (আয়াত-১০৭)। এদের ব্যাপারে বিচারে এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, এরা যদি আল্লাহর জন্য হিজরত করে এবং সংগ্রাম করে এবং ইসলামের জন্য সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যসহকারে সহ্য করে তাহলে আল্লাহ তা'লা তাদের পূর্বকৃত পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তাহলেই কেবল প্রমাণিত হবে, তারা তাদের পূর্বকৃত ত্রুটিসমূহ সম্পূর্ণ সংশোধিত করে ফেলেছে। সেজন্য এ আয়াতে ব্যবহৃত জিহাদ শব্দের অর্থ 'তলোয়ারের যুদ্ধ' নয়, বরং ইসলামের উন্নতির জন্য চেষ্টাসাধনা করে যাওয়া।

হাদীস শরীফ

নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত

হাদীস :

আন হুযায়েফাতা (রা.) ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহে (সা.) তাকুনু নাবুওয়াতু ফিকুম মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মাতাকুনু খিলাফতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওয়াতে মাশাআল্লাহহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহুহাল্লাহু তা'লা সুম্মাতাকুনু মুলকান আযযান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তাআলা সুম্মা তাকুনা মুলকান জাবা রিয়্যাতান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আনতাকুনা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নুবুওয়াতে সুম্মা সাকাতা।

অর্থাৎ হযরত হুযায়েফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআন হতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ তা'লা ঈমান আনয়নকারী ও পুণ্যকর্মকারীদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার ওপর সঠিকভাবে আমল করবে, তখন আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, **"ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাইয়াস তাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম"** এর বিষয়টিকে কিছু লোক ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা 'মিনকুম' - তোমাদের মধ্য হতে–অনুবাদক)-এর অর্থ শুধু সাহাবাদের (রা.) নিয়ে থাকেন, এবং বলেন খেলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে ও কিয়ামত পর্যন্ত খেলাফতের নাম-গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো খেলাফত স্বপ্নের মত শুধু ত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধ:পতনের অশুভ-গর্ভে নিপতিত হয়ে গেলো।"

"এগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তবে আমি কিভাবে বলতে পারি যে, সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খেলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খেলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে তবে মূসা (আ.)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল?"

"যেহেতু মানুষের জন্য কোন স্থায়ীত্ব নেই, তাই আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্তার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি খেলাফত সৃষ্টি করেছেন, যাতেকরে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনও বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু ত্রিশ পর্যন্ত মানে, সে মূর্খতাবশতঃ খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদা তা'লার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূল করীম (সা.)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন আর এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংসও হয়ে যায়, তবে কোন পরওয়া নেই" (শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৩৪, পৃঃ ৫৮)।

খেলাফতের রজ্জুকে ধরে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর আশীষ হতে কল্যণমন্ডিত হবার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

আমি খোদা তা'লার এক মূর্তিমান কুদরত আমার পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয় কুদরতের প্রকাশস্থল হবেন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

কারো স্থলাভিষিক্তকে খলীফা বলে। আর রসূলের স্থলাভিষিক্ত সত্যিকার অর্থে তিনিই হতে পারেন, যিনি প্রতিচ্ছায়ারূপে রসূলের গুণাবলী নিজের মাঝে রাখেন। এ জন্য রসূল করীম (সা.) চান নি যে, অত্যাচারী বাদশাহদের জন্য খলীফা শব্দ ব্যবহৃত হোক। কেননা, বাস্তবিক-অর্থে খলীফা রসূলের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। যেহেতু কোন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না, সেহেতু খোদা তা'লা সংকল্প করে নিয়েছেন–রসূলের সত্তা যা জগতের অপরাপর সকল সত্তা থেকে সম্মানিত ও সর্বোত্তম, সেটাকে যেন প্রতিচ্ছায়া আকারে কিয়ামতকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই খোদা তা'লা খিলাফত ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছেন যাতে জগত কখনও কোন যুগে নবুওয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানে, সে নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকেই উপেক্ষা করে যায়। আর জানে না যে, এটা কখনও খোদা তা'লার ইচ্ছা ছিল না– রসূলে করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত নবুওয়তের বরকতকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। এরপর এ জগৎ ধ্বংস হয়ে যাক এতে কিছু যায় আসে না!

...সুতরাং খোদা তা'লার ব্যাপারে এমনটা মনে করা একটা হীন-চিন্তাধারা যে, তাঁর শুধুমাত্র ...ত্রিশ বছরের চিন্তা ছিল। পরে সর্বদার জন্য পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দিয়েছেন। আর ঐ নূর যা প্রাচীন কাল থেকে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের মধ্যে খিলাফতের আয়নায় পরিদৃষ্ট হতো, এদের জন্য তা দেখানোর অনুমতি নেই! সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি কি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল খোদার জন্য এ বিষয়টি মেনে নিতে পারে? কখনও না। আর এ আয়াত ইমামদের খিলাফতের বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী। ...কেননা, এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলছে ...খিলাফত চিরস্থায়ী। এজন্য ÔBqwigyvÕ শব্দ স্থায়ীত্বকে চায়। কারণ হলো, যদি শেষ সুযোগ দুষ্কৃতকারীরা পেয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী তারাই হয়ে যাবে – সৎকর্মশীলরা হবে না। সবার উত্তরাধিকারী তারাই হয় যারা সবার পরে আসে। (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩-৫৪)

"যখন আমরা কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেই। আর গভীর দৃষ্টিতে তা দেখি, তখন এটা উচ্চ স্বরে এই বলতে থাকে–আধ্যাত্মিক শিক্ষক সর্বদা বিদ্যমান থাকবে এটাই এর মূল অভিপ্রায়। ...এছাড়া আরও কতিপয় আয়াত আছে যা থেকে প্রমাণ হয়, খোদা তা'লা অবশ্যই এ ইচ্ছা পোষণ করেছেন, আধ্যাত্মিক শিক্ষক যারা নবীদের উত্তরাধিকারী, তারা যেন সর্বদা হতে থাকেন। আর তা এই (সূরা নূর-৫৬) অর্থাৎ খোদা তা'লা তোমাদের জন্য ওয়াদা করেছেন –তিনি তোমাদেরকেও পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের করেছেন। ...এই আয়াতকে যদি কোন ব্যক্তি গুরুত্বের সাথে ও গভীরভাবে দেখে, তাহলে আমি কিভাবে বলব–এ লোক এ বিষয়কে বুঝবে না যে, খোদা তা'লা চিরস্থায়ী-খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি খিলাফত চিরস্থায়ী না হতো, তাহলে মূসায়ী শরীয়তের খিলাফতের সাদৃশ্য বর্ণনার মাহাত্ম্য কি? আর খিলাফতে রাশেদা তিরিশ বছর থাকার পর সর্বদার জন্য যদি বিলুপ্তি ঘটে, তাহলে এটা থেকে ফলাফল দাঁড়ায় যে, খোদা তা'লার এ ইচ্ছা কখনও ছিল না, এ উম্মতের জন্য সর্বদা সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত থাকুক। আর মূলতঃ আধ্যাত্মিকতার মৃত্যুতে ধর্মের মৃত্যুও অনিবার্য হয়ে পড়ে।" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ৩৫১-৩৫৩)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩৭তম কিস্তি)

এখন 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দের সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বানুসন্ধান যখন সুসম্পন্ন হল এবং প্রমাণিত হল যে, সমগ্র কুরআন করীম জুড়ে এ শব্দটি কেবল আত্মাকে 'কব্‌জ' করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর 'রাফেউকা ইলাইয়া' বাক্যটিতে 'রাফআ' শব্দটি পবিত্র কুরআনে কী অর্থে ব্যবহৃত– এ বিষয়টি দেখা বাকী রইল। অতএব জানা আবশ্যক, কুরআন করীমে 'রাফআ' শব্দটি যেখানেই নবীগণ ও পুণ্যবানদের সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে সাধারণভাবে সর্বত্র এর এ অর্থই বুঝায় যে, এই পুণ্যবান মনোনীত-বান্দাদের জন্য খোদা তা'লার সন্নিধানে তাঁদের আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যে মাকাম ও তাঁদের আত্মিক উৎকর্ষ ও উন্নয়নের দিক দিয়ে আকাশে কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ যে উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে, সেটি যেন প্রকাশ করা হয় এবং যাতে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়া হয় যে মৃত্যুর পর তাদের বিদেহী-আত্মাকে সেই মার্গে ওঠানো হবে, যা তাদের ঐশী-নৈকট্যের মাকাম (পদ-মর্যাদা) হিসেবে নির্ধারিত। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য নির্ধারিত উচ্চমর্যাদা প্রকাশার্থে কুরআন করীমে বলেন, **'তিলকার রুসুলু ফায্‌যালনা বা'যাহুম আলা বা'যিন মিনহুম মান কাল্লামাল্লাহু ওয়া রাফাআ বা' যাহুম দারাজাত'** (সূরা বাকাহ ঃ ২৫৪)। অর্থাৎ এ সকল রসূল তাঁদের মাকাম ও মর্যাদায় সবাই পরস্পর সমান নন। তাঁদের মধ্যকার কতক এমন রয়েছেন, যাদেরকে তিনি সামনা-সামনি প্রত্যক্ষ কথপকোথনের সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন এবং কেউ এমনও আছেন, যাকে (সা.) পদমর্যাদায় সর্বাধিক 'রাফা' প্রদান তথা উন্নীত করা হয়েছে।

এ আয়াতের তফসীর হাদীসাবলীতে এটিই বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর সকল নবীর আত্মাকে আকাশে (উর্ধ্বলোকে) উঠানো হয় এবং প্রত্যেকের পদ-মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর আত্মাকে আকাশসমূহের মাঝে কোনো আকাশে কোনো মাকাম বা অবস্থান দেয়া হয়। এ সম্পর্কেই বলা হয় যে, ওই মাকাম বা মার্গ পর্যন্ত সে-আত্মাটির 'রাফা' সাধিত হয়েছে বা সে মার্গে উন্নীত হয়েছে, যাতে করে অভ্যন্তরীণভাবে সে-আত্মার যে পদ-মর্যাদা নির্ধারিত ছিল, সেটি প্রকাশ্যভাবে প্রমাণ করে দেখানো যায়। অতএব, তার সেই 'রাফআ', যা আকাশের দিকে হয়ে থাকে, এটি তার উল্লিখিত পদ-মর্যাদা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আর উপরোল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত **'রাফাআ বা'যাহুম দারাজাতিন'**- বাক্যটিতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'রাফআ' (আত্মিক উন্নয়ন) অবশ্যই সকল নবীর 'রাফআ'-এর চেয়ে উচ্চতর। তাঁর আত্মা হযরত মসীহ্‌র আত্মার মতো দ্বিতীয় আকাশে নয় এবং হযরত মূসার আত্মার ন্যায় ষষ্ঠ আকাশেও নয়, বরং সবার উর্ধ্বে অবস্থিত। মে'রাজের হাদীস সুস্পষ্টত এরই প্রমাণ বহণ করে। বরং 'মাআ লিমুন্ নবওয়াত' গ্রন্থের ৫১৭ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মি'রাজের রাতে মহানবী (সা.) যখন ষষ্ঠ আকাশ ছেড়ে আরও উর্দ্ধে ওঠে গেলেন তখন হযরত মূসা বললেন : "রাব্বি লাম্ আযুন্না আইঁইউর্‌ফাউ আলাইয়া আহাদুন" অর্থাৎ হে আমার প্রভু- প্রতিপালক! আমি কখনও ভাবি নি যে, কোনো নবীকে আমার চেয়েও উর্দ্ধে ওঠানো হবে এবং সে তার 'রাফআ'-এর ক্ষেত্রে আমাকে অতিক্রম করে যাবে।' এখন লক্ষ্য করুন, 'রাফআ' শব্দটি কেবল উন্নত মার্গ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লিখিত হাদীসসমূহের আলোকে আলোচ্য আয়াতটির অর্থ এটাই প্রতিভাত করেছে যে, প্রত্যেকে নিজ পদ-মর্যাদা ও মার্গ অনুযায়ী আকাশ সমূহের দিকে উত্থিত হয়ে থাকে এবং নিজ নিজ ঐশী নৈকট্যের পরিমাপ অনুযায়ী 'রাফআ' (তথা আত্মিক উর্দ্ধারোহণ) থেকে অংশ লাভ করে থাকে। নবীগণ এবং আল্লাহ্‌র অলিগণের আত্মা ইহকালীন জীবদ্দশায় ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থান করা সত্ত্বেও সেই আকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে যা

তাদের আত্মার জন্য 'রাফআ' বা আত্মিক উন্নয়নের মার্গ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে এবং মৃত্যুর পর সে-সব আত্মা তাদের জন্য সীমারেখা স্বরূপ নির্ধারিত আকাশে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং যে-হাদীসটিতে সাধারণভাবে মৃত্যুর পর আত্মাসমূহকে (উর্দ্ধলোকে) ওঠানোর উল্লেখ রয়েছে সে-হাদীসটিও এ বর্ণনাকে সমর্থন করে। যেহেতু এ বিতর্কটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার এবং পূর্বেও আমি এ সম্পর্কে বর্ণনা করে এসেছি, কাজেই এটি আরও দীর্ঘায়িত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এস্থলে এ বিষয়টিও বর্ণনা করা আবশ্যক যে কোনো কোনো তফসীরকার যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, 'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা' বাক্যটিতে 'তওয়াফ্‌ফি' শব্দের অর্থ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু দেওয়াই বটে এবং এরপর যে 'রাফিউকা ইলাইয়া' বাক্যটি রয়েছে, এটিও সুস্পষ্টত এতে মৃত্যুর নির্দেশিকার দরুন যেহেতু আত্মার 'রাফআ' (ঊর্ধ্বারোহণ)-এর বিষয়টিই বুঝাচ্ছে, সেহেতু তারা মহাচিন্তায় পড়ে নিজেদেরকে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান 'তরতীব' তথা ক্রমিক ধারার সংশোধনকারী হিসেবে নিজিদের জন্য ওস্তাদের আসনে বসার অধিকার সাব্যস্ত করে আয়াতটির সংশোধনী তুলে ধরেন যে, এ জায়গায় 'রাফেউকা' বাক্যটি আগে আসবে এবং 'মুতাওয়াফ্‌ফিকা' বাক্যটি পরে যাবে। কিন্তু দর্শকগণ জানেন যে, খোদা তা'লার পবিত্রতম ও প্রাঞ্জলতম কালাম বা বাণীতে এটা যে কতো বড় অনধিকার-চর্চা এবং এ মহা-সম্মানিত কিতাবের অবমাননার কারণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ স্থলে এও জানা আবশ্যক, খোদা তা'লা যে হযরত মসীহ্ সম্পর্কে বলেছেন ঃ **"ওয়ামা কাতালুহু ওয়ামা সালাবূহু ওয়া লাকিন শুব্বিহা লাহুম"** [(সূরা নিসা ঃ ১৫৮) অর্থাৎ ইহুদীরা হযরত মসীহ্‌কে হত্যা করতে বা ক্রুশবিদ্ধ করে মারতে পারে নি, বরং তাঁকে তাদের জন্য (নিহত বা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত ব্যক্তির) সদৃশ করা হয়েছিল– অনুবাদক]। এ কথা দ্বারা কখনও বুঝায় না যে, হযরত মসীহ্ কখনও আর মারা যান নি। মারা যাওয়ার জন্য কি এটাই একমাত্র পথ যে, মানুষকে যেন হত্যা করা হয় বা ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করা হয়?! বরং উল্লিখিত এই অস্বীকৃতির উদ্দেশ্য ও অর্থ হলো, তৌরাতের দ্বিতীয় বিবরণ, ২১ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক বা সূত্রে লেখা আছে, 'যাকে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করা হয়, সে খোদার অভিশপ্ত'। ইহুদী, যারা নিজেদের ধারণায় হযরত ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করেছিল, তারা তৌরাতের উক্ত শ্লোক বা সূত্র অনুযায়ী মনে করতো যে ঈসা-মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম আদৌ নবী ছিলেন না এবং খোদার কোনো প্রিয় বান্দাও ছিলেন না। কেননা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করা হয়েছিল। আর তৌরাত বর্ণনা করছে যে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যে ব্যক্তি মারা যায়, সে অভিশপ্ত হয়ে থাকে। অতএব, খোদা তা'লার অভিপ্রেত (বা সিদ্ধান্ত) ছিল, তিনি ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে ইহুদীদের উল্লিখিত দাবীকে খন্ডন করবেন, তাই তিনি বলেন যে, মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম প্রকৃতপক্ষে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান নি এবং নিহিতও হন নি। বরং তিনি যথা সময়ে স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যান।

(২) প্রশ্ন ঃ যে মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের আগমনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তিনি সত্যি-সত্যি মরিয়ম-পুত্র মসীহ্ নন বরং তিনি তাঁর কোনো সদৃশ বা প্রতিচ্ছবি হবেন– এমনটি কোথায় এবং কোন কিতাবে লেখা আছে?

উত্তর ঃ এ বিষয়টি তো প্রথমে কুরআন করীমেই সুস্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে, যখন পবিত্র কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করছে যে, পৃথিবীতে এমন কোনো নবী আসেন নি, যিনি মারা যান নি। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ **'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন ক্বাদ্ খালাত্ মিন ক্বলিহির রুসুল আফাইন্‌মাতা আও ক্বুতিলা-নক্বালাব্‌তুম আলা আকাবিকুম।'**

উত্তর ঃ এ বিষয়টি তো প্রথমে কুরআন করীমেই স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন যখন পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন নবী আসেন নি, যিনি মারা যান নি। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন ক্বাদখালাত্ মিন্ কাবলিহির রুসুল আফাইম্ মাতা আও ক্বুতিলা-নক্বালাব্‌তুম আলা আ'ক্বাবিকুম'** (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪৫)

'ওয়ামা জায়ালনা লি-বাশারিম্ মিন ক্বাবলিকাল খুল্‌দা।' 'ওয়ামা জায়ালনাহুম জাসাদাল্ লা ইয়াকুলূনাত্ তোয়ামা ওয়ামা কানু খালিদীন।' [অর্থঃ 'আর মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। নিশ্চয় তার পূর্বের সব রসূল গত হয়েছে। অতএব সে-ও যদি মারা যায় বা নিহিত হয় তবে তোমরা কি তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে? (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪৫)। 'আর আমরা তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে চিরস্থায়ী (জীবন দান) করি নি' (আল্ আম্বিয়া ঃ ৩৫)। 'আর আমরা তাদের এমন দেহবিশিষ্ট করে বানাইনি, যারা খাবার খেত না। আর তারা কখনও চিরকাল বেঁচেও থাকেনি।' (আল্ আম্বিয়া ঃ ৯) অনুবাদক]।

এ আয়াতগুলো প্রকাশ্যে উচ্চৈস্বরে হযরত মসীহ্‌র মৃত্যুর সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে জীবিত বলে ধারণা করা এবং **'ওয়ামা জায়ালনাহুম জাসাদাল্‌লা ইয়াকূলনাত্ তোয়ামা'**– আয়াতটির স্বতঃস্পষ্ট অর্থের বিপরীতে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, হযরত মসীহ্ মাটির দেহসমেত দ্বিতীয় আকাশে খাওয়া-খাদ্যের কোনো প্রয়োজন ছাড়াই ফিরিশ্‌তাদের মতো জীবিত রয়েছেন–এটা প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লার পবিত্র কালামের প্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন বৈ কিছু নয়।

আবারও বলছি, হযরত মসীহ্ যদি মাটির এই দেহসহ (দ্বিতীয় আকাশে) জীবিত থাকেন, তাহলে উল্লিখিত আয়াতগুলোতে খোদা তা'লা কর্তৃক এ মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করা যে, মহানবী (সা.) মারা যাওয়াতে তাঁর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে একারণে কোন আপত্তি আসতে পারে না যে, আবহমানকাল থেকে সকল নবীই মৃত্যুবরণ করে এসেছেন– উপস্থাপিত এ যুক্তি একেবারে অকেজো ও অহেতুক বরং অবান্তর বলে সাব্যস্ত হবে। অথচ খোদা তা'লা কখনও মিথ্যা বা অবাস্তব কোনো কথা বলতে পারেন না। এটা তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বিরোধী।

অতএব, হযরত মসীহ্ যখন সুস্পষ্টত মারা গেছেন তখন মৃত্যুর পর তিনি পৃথিবীতে আর আসতে পারেন না এবং কুরআন করীমে তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় তাঁর জীবিত হওয়ারও কোন সংবাদ দেয়া হয়নি। কাজেই নিঃসন্দেহে (এ উম্মতে) আগমনকারী মসীহ্ প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম নন, বরং তিনি হবেন তাঁর কোনো সদৃশ (বা প্রতিচ্ছবি হিসেবে ভিন্ন ব্যক্তি)। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিগত (বনি ইসরাঈলী) মসীহ্র হুলিয়া এক রকম বর্ণনা করেছেন এবং আগমনকারী মসীহ্র হুলিয়ার ভিন্ন-রকম বর্ণনা রেখে গেছেন। আর বিগত মসীহ্ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি নবী ছিলেন।

কিন্তু আগমনকারীকে তাঁরই উম্মত বলে অভিহিত করেছেন, যেমন 'ইমামুকুম মিনকুম' (অর্থঃ তিনি তোমাদেরই মধ্যকার তোমাদের ইমাম হবেন)– হাদীসটি থেকে সুপ্রতিভাত। তাছাড়া **'উলামাউ উম্মতি কা-আম্বিয়ায়ি বানি ইসরাঈল'–** হাদীসটিতেও ইঙ্গিতে নির্দেশ রয়েছে যে, তিনি বনি ইসরাঈলী মসীহ্র সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হবেন। অতএব তদোনুযায়ী আগমনকারী মসীহ্ 'মুহাদ্দাস' (বহুল ওহী প্রাপ্ত) হওয়ার কারণে রূপকভাবে নবীও বটে। তাই এর চেয়ে বেশি স্পষ্টাকার বর্ণনা আর কি হতে পারে?! তাছাড়া, হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম যার আত্মা **'ইয়া আইয়াতুহান্ নাফ্সুল মুত্মাইন্না তুরজিয়ি ইলা রাব্বিকি রাযিয়াতাম্ মার্যিয়াহ্ ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি"–** পবিত্র আয়াত অনুযায়ী যখন জান্নাতে প্রবেশ লাভ করেছে তখন কী করে পুনরায় এ পরীক্ষাগার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন?! যদিও একথা আমরা মানি যে 'হাশর' সম্পর্কিত পুনরুত্থানের পর প্রত্যেক উপযুক্ত আত্মাকে বেহেশ্তে পুরোপুরি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রবেশাধিকার দান করা হবে। কিন্তু এ যাবৎকালও বেহেশ্তের যে পরিমাণ সুস্বাদ প্রদান করা হয়েছে তাথেকে ঐশী নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বহিষ্কার বা বিচ্ছিন্ন করা হয় না এবং কিয়ামত দিবসে 'রাব্বুল-আলামীন' আল্লাহ্র সমীপে তাদের উপস্থিতিও বেহেশ্ত থেকে তাদের বহিষ্কৃত হওয়ার কারণ হয় না। কেননা এমন তো নয় যে বেহেশ্তের বাইরে কোনো কাঠ বা লোহা কিম্বা রূপা নির্মিত সিংহাসন পাতা হবে আর খোদা তা'লা সেখানে জাগতিক শাসক ও রাজা-বাদশাহ্দের ন্যায় উপবিষ্ট হবেন এবং কিছুটা ব্যবধান অতিক্রম করে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে! এতে করে আবশ্যকীয়ভাবে এ আপত্তির উদ্ভব হবে যে বেহেশ্তবাসীদের বেহেশ্তে প্রবিষ্ট বলে সাব্যস্ত হয়েও তাদের তলবের সময় বেহেশ্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, আর কি-না ধুসর লতাপাতাহীন প্রান্তর যেখানে রাব্বুল আলামীনের সিংহাসন পাতা হয়ে থাকবে সেখানে সমবেত হতে হবে– এরকম ধারণা তো একেবারে জাগতিক এবং ইহুদী স্বভাবপ্রসূত বলেই প্রতীয়মান হয়! আর ধ্রুব সত্য এটাই যে, আমরা শেষ বিচার-দিবসে ঈমান রাখি। এবং রাব্বুল আলামীনের সিংহাসনেও বিশ্বাসী।

কিন্তু জাগতিক ও পার্থিব ধারায় আমরা এর চিত্র আঁকি না। বরং এ কথায় দৃঢ়বিশ্বাসী যে, আল্লাহ্ ও রসূল যা কিছু ব্যক্ত করেছেন তা সবই পূর্ণ হবে, কিন্তু এমন পবিত্র ধারায় হবে যা খোদা তা'লার পরম পবিত্রতা ও স্বচ্ছ নির্মলতা এবং তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীর পরিপন্থী না হয়। বেহেশ্ত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার পরম সত্তা ও সত্য গুণাবলীর বিকাশস্থল। কাজেই এটা কি করে বলা যায় যে সে-দিন খোদা তা'লা যেন সম্পূর্ণ এক মানবাকারে বেহেশ্তের বহিরাঙ্গনে তাঁর বিশেষ তাঁবু বা অন্য কথায় তাঁর সিংহাসন বিছিয়ে দিবেন। বরং প্রকৃত-সত্য এটাই যে, সেদিনও বেহেশ্তবাসী বেহেশ্তেই অবস্থান করবেন এবং দোজখীরা দোজখেই থাকবে। কিন্তু ঐশী কৃপার মহতী বিকাশ-প্রকাশ সত্যপরায়ণ ও ঈমানদারদের প্রতি নতুন ধারায় এক পরম সুস্বাদের বারিধারা বর্ষণ পূর্বক এবং বেহেশ্তী জীবনের সার্বিক উপাদান ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক, আত্মিক ও দৈহিকভাবে দেখানোর মাধ্যমে এক নতুন আকারের 'দারুস্-সালাম' তথা প্রশান্তিময় আবাসস্থলে তাদের প্রবেশের কারণ হবে। অনুরূপভাবে (অপরদিকে) খোদা তা'লার ক্রোধ ও শাস্তিমূলক রুদ্রমূর্তির প্রকাশ হিসাব-নিকাশ ও বিচার-প্রক্রিয়া প্রকাশ্য ও সার্বিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে জাহান্নামকেও এক নতুন আকারে দেখিয়ে জাহান্নামবাসীদের যেন আবার নতুনভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। মৃত্যুর পরে পরে বেহেশ্তীদেরকে রূহানী ও আধ্যাত্মিকভাবে তৎক্ষণাৎ বেহেশ্তে প্রবেশ এবং দোজখিদেরকে দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়া– এসবই পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসাবলী থেকে ধারাবাহিক বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে সপ্রমাণিত। কতদূর পর্যন্ত আর কত কলেবরে আমরা এই পুস্তকটি বর্ধিত করে যাবো? হে সর্বশক্তিমান খোদা! এ জাতির প্রতি দয়াপরবশ হও- যারা আল্লাহ্র কালাম পাঠ করে, কিন্তু এ পাক-পবিত্র বাণী তাদের কণ্ঠনালী পেরিয়ে নীচে নামে না, তাদের গ্রীবাদেশ অতিক্রম করে তাদের হৃদয়পট স্পর্শ করে না।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

আশিসমণ্ডিত কল্যাণ বিতরণের মাস পবিত্র রমযান আসন্ন। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে জানাই 'রমযানুল মুবারাক'

-সম্পাদক

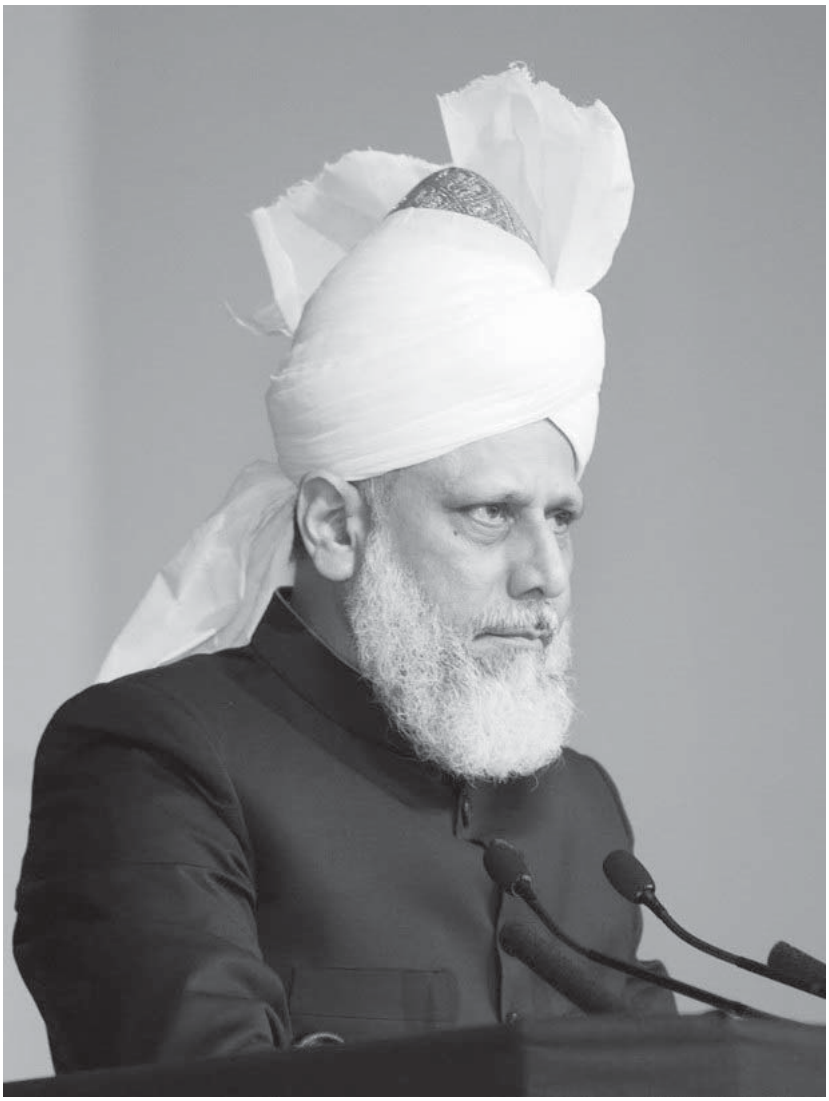

জুমুআর খুতবা

জলসা সালানা– আল্লাহ্‌র কৃপাবারী বর্ষণ-ধারা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৪ অক্টোবর, ২০১৬ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডার বার্ষিক-জলসা গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন প্রদর্শন করে শেষ হয়েছে। এর জন্য আমরা খোদার দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন, তা যথেষ্ট হবে না। এটি খোদা তা'লারই অনুগ্রহ যে, সাধ্য, সামর্থ্য ও উপকরণ সীমিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে পৃথিবীর সর্বত্র জলসা করার তৌফিক দান করেন। আর শুধু খোদার কৃপা ও অনুগ্রহের ফলেই আমাদের জলসার ব্যবস্থপনাও মোটের উপর ভালো হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের জন্য পেশাদার এবং দক্ষ মানুষ আমাদের কাছে নেই, যারা বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করতে পারে। খোদ্দাম, আতফাল, আনসার, লাজনা এবং নাসেরাত সদস্যদের মধ্য থেকেই আমাদের স্বেচ্ছাসেবী হয়ে থাকেন। কর্মকর্তা এবং অধীনস্তরাও এদেরই মধ্য থেকে নিযুক্ত হয়। জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিকেও অনেক

> এটি খোদা তা'লারই অনুগ্রহ যে, সাধ্য, সামর্থ্যও উপকরণ সীমিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে পৃথিবীর সর্বত্র জলসা করার তৌফিক দান করেন। আর শুধু খোদার কৃপা ও অনুগ্রহের ফলেই আমাদের জলসার ব্যবস্থপনাও মোটের উপর ভালো হয়ে থাকে।

সময় কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তখনো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীধারী ব্যক্তিও তার আনুগত্য করে। কেউ বলে না যে, আমি উচ্চ শিক্ষিত, আমি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাঝেই আমরা আনুগত্যের এই মান লক্ষ্য করি। তারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে আর শুধু সহযোগিতাই নয়, বরং যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, পরিপূর্ণ আনুগত্য করে এবং আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের উপর অর্পিত সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য তারা পালন করে। এমন মনে হয়, যেন বিশেষ করে এই তিন দিনে প্রত্যেক দায়িত্ব পালনকারীর মাথা থেকে জাগতিকতার চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে গেছে। যেসকল কর্মী এই সেবার জন্য নিজেদেরকে নিবেদন করে, তাদের মাথায় কেবল জলসা এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার চিন্তাই ঠাঁই পায়, যা চিন্তাধারার প্রবাহকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, তা মানুষের কর্মকে বানায় নিঃস্বার্থ আর তাকে বানায় বিনয়ী। অতএব, এটি মানবীয় কোন কাজ নয়। এটি শতভাগ খোদা তা'লার অনুগ্রহ এবং কৃপা। আর এটি যদি খোদার কৃপা না হতো, তাহলে যে প্রেরণা ও চেতনা নিয়ে সকল শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও মহিলারা কাজ করেন, তা কখনোই সৃষ্টি হতো না। এসকল কর্মীর অন্তরে আল্লাহ্ তা'লাই এই চেতনা সঞ্চারিত করেন যে, সকল প্রকার চিন্তা-চেতনা ও কামনা-বাসনার উর্ধ্বে উঠে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য তোমাদের নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হবে এবং কাজ করতে হবে, আর শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টি এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করাকেই দৃষ্টিতে রাখতে হবে।

অতএব, সর্বপ্রথম আমাদের উচিত,আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। কেননা, জামা'তকে এমন সেবা দানকারী কর্মীবাহিনী তিনিই দান করেছেন, যারা উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। তাদেরকে টয়লেট পরিষ্কার করতে বললে তা-ও করে, খাবার রান্না করতে বললে রান্না করে, খাওয়াতে বললে খাবার খাওয়ায়। এছাড়া নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে, পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে ডিউটি দেয়, অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভাগেও তারা দায়িত্ব পালন করে। আর যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, তারা সবাই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। শিশুরাও গভীর আগ্রহের সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। জলসাস্থলে তারা যখন নীরবে এবং গভীর আন্তরিকতার সাথে অতিথিদের পানি পান করায়, তখন অ-আহমদী অতিথিরা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, শিশুদের মাঝে সেবার এই প্রেরণা তোমরা কিভাবে সঞ্চার কর! পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী যেখানে মাদ্রাসাগামী শিশু ও যুবকদেরকে জিহাদের নামে বিভিন্ন ভ্রান্ত কাজ ও অন্যায়-অবিচারের শিক্ষা দিচ্ছে এবং নৃশংসভাবে মানুষের প্রাণ হননের শিক্ষা দিচ্ছে আর জীবন ধ্বংসের পায়তারা করছে, সেখানে জামা'তে আহমদীয়ার শিশু ও যুবকরা প্রাণ সঞ্চারী কাজ করে চলেছে। যখন ঐশী পানি পান করানোর এবং আধ্যাত্মিক খাবার খাওয়ানোর অধিবেশন বসে, তখন শিশু ও যুবকরা জাগতিক পানি পান করানো এবং খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বও পালন করে থাকে। আর এভাবে তারা সত্যিকার সেই জিহাদের অংশ হয়ে যায়, যা প্রাণ হরণের জন্য নয়, বরং প্রাণ সঞ্চারের জন্য করা হয়। অতএব, এ বিষয়ে অনেকেই তাদের মতামত প্রকাশ করে বলে যে, শিশুরা যখন প্রফুল্লচিত্তে এবং দায়িত্বের সাথে পানি পান করায়, তখন তাদের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্নেহ ও ভালোবাসার উদ্রেক হয়।

অতএব, এ জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত আর একই সাথে যারা জলসায় অংশগ্রহণ করেন এবং জলসা শুনেন, তাদের সবারও সেই সব কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, যাদের অনেকেই জলসার সফল ব্যবস্থপনার জন্য জলসার অনেক পূর্ব থেকেই কাজ করেন এবং পরে আবার জলসার জিনিসপত্র গুটানোর কাজেও সময় দিয়ে থাকেন। তারা তাদের ব্যক্তিগত কাজ এবং অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির কোন তোয়াক্কা করে না। এমন অনেকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যারা আমাকে জানিয়েছেন যে, জলসার দায়িত্ব পালনের জন্য ছুটি না পাওয়ায় তারা চাকরিই ছেড়ে দিয়েছেন। এরা নিজেদের ঘুম এবং বিশ্রামকেও গুরুত্ব দেয় না। এক ধরণের ব্যাকুলতা নিয়ে এরা কাজ করে। অর্থাৎ, মাথায় এই চিন্তা থাকে যে, আমাদের সেবা করতে হবে এবং জলসার ব্যবস্থাপনাকে যতটা সম্ভব উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। অতএব, জলসায় অংশগ্রহণকারীদের কিছু বলার পূর্বে আমি নিজে সকল কর্মী, শিশু, অতিথি, ছেলে, মেয়ে, পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই, যারা স্বেচ্ছায় সেবা করার প্রেরণা নিয়ে নিজদেরকে উপস্থাপন করেছেন এবং সেবার এক গভীর প্রেরণা নিয়ে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ দায়িত্বও সানন্দে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। জলসার এ কাজ আসলে এক

ধরণের নীরব তবলীগ হয়ে থাকে। বাহ্যত এসব কর্মী নীরবে কাজ করতে থাকেন, কিন্তু বাহিরে থেকে যে সকল অতিথি আসেন, তাদের জন্য এটি তবলীগের ভূমিকা পালন করে এবং অনেকের হেদায়াতেরও কারণ হয়। যেমন, আমেরিকা থেকে আগত এক অ-আহমদী বন্ধু, যিনি একজন বাংলাদেশী, তিনি বাঙ্গালী আহমদীদের সাথে এখানে এসেছিলেন, তার নাম শহীদুর রহমান। তিনি বলেন, মোল্লাদের সাথে সারা জীবন তার তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, এর ফলে তার সামনে যে ইসলাম উপস্থাপিত হয়েছে, তা তাকে সুন্নী মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ধর্মীয় উগ্রতার প্রতি তার চরম ঘৃণা ছিল। তার স্ত্রী একজন নেক মহিলা। তার স্ত্রী তাকে তাগিদ দিয়ে বলেছেন, আপনি আহমদীয়া জামা'তের জলসায় যান। আমেরিকা থেকে প্রায় ৯১জন বাঙ্গালী এসেছিলেন। এভাবে তিনি তার বাঙ্গালী বন্ধুদের সাথে এই জলসায় যোগ দেন এবং জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যদের সুশিক্ষা, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের পর পুনরায় আমি ইসলামের দিকে মুখ ফিরিয়েছি। জলসার শেষ দিন তিনি সকল মানুষের ভিড় থেকে পৃথক হয়ে একটি চেয়ারে বসে ছিলেন আর ভিড়ের জন্য খাবার খেতে যেতে ভালো লাগছিল না। ইত্যবসরে একজন আহমদী যুবক তার কাছে আসে এবং তাকে খাবার ও পানি পরিবেশন করে। এরপর সেই যুবক তার খাবার শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, যেন খাবার শেষে সেই পাত্রটি সে যথাস্থানে ফেলে দিতে পারে। এই ঘটনা তার ওপর এমন সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে যে, আমার সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি আমাকে বলেছেন, জলসা তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে আর অচিরেই তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করবেন, ইনশাআল্লাহ্। অতএব, এভাবে জলসার মাধ্যমে তবলীগও হয়ে থাকে। কেবল এক যুবকের উন্নত চরিত্র এবং সামান্য সেবাই তার চিন্তাধারায় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আহমদী সেই যুবক হয়তো জানতও না যে, ইনি আহমদী, না অ-আহমদী। সে এক গভীর আন্তরিকতা নিয়ে সেবা করেছিল, কিন্তু এই সেবা সেই অ-আহমদীর জীবনে আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের কারণ হয়েছে। অনুরূপভাবে, কতিপয় রাজনীতিবিদ এবং এ অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ মানুষও মোটের উপর জামা'তের সেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত আর তারা এটি স্বীকারও করে যে, প্রতিবারই জলসার ব্যবস্থাপনার একটি নিত্য-নতুন ইতিবাচক প্রভাব তাদের ওপরও পড়ে আর তা হল, এত বড় সমাবেশ, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ একসাথে বসে থাকে এবং কর্মীরাও নীরবে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

এখানের 'ওয়ান' পার্লামেন্টের একজন সাংসদ, ডেব শোল্টে সাহেব বলেন, বরাবরের মত আজও আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। জলসায় ব্যাপক সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীকে দেখা যায়, যারা জলসার কার্যক্রমকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে। তিনি আরো বলেন, আমার ধারণা অনুসারে আজ এখানে ২৫ হাজারের অধিক মানুষ সমবেত হয়েছে আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এত সুশৃঙ্খলভাবে জলসা সম্পন্ন হওয়া এই স্বেচ্ছাসেবীদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। অতএব, মানুষের উপর এই স্বেচ্ছাসেবীদের গভীর প্রভাব পড়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। নিঃস্বার্থভাবে অতিথি সেবার পাশাপাশি তারা নীরব মুবাল্লিগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আহমদীয়াতের বাণীও প্রচার করেন। কাজেই, যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, জলসায় অংশ নেয়া প্রত্যেকেরই উচিত তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। সকল কর্মীর সেবার এই চেতনাকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকুন এবং তাদেরকে এই সেবার সর্বোত্তম প্রতিদানও দিন। আর তাদের এই সেবা যেন শুধু বাহ্যিক সেবাই না হয়, বরং তাদের ঈমান-একিনও যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে আর তাদের কর্মও যেন ইসলামী-শিক্ষা-সম্মত সর্বোত্তম কর্ম হয়।

> এমন মনে হয়, যেন এই তিন দিনে বিশেষ করে প্রত্যেক দায়িত্ব পালনকারীর মাথা থেকে জাগতিকতার চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে গেছে। যেসকল কর্মী এই সেবার জন্য নিজেদেরকে নিবেদন করে, তাদের মাথায় কেবল জলসা এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার চিন্তাই ঠাঁই পায়, যা চিন্তাধারার প্রবাহকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, তা মানুষের কর্মকে বানায় নিঃস্বার্থ আর তাকে বানায় বিনয়ী। অতএব, এটি মানবীয় কোন কাজ নয়। এটি শতভাগ খোদা তা'লার অনুগ্রহ এবং কৃপা। জলসার এ কাজ আসলে এক ধরনের নীরব তবলীগ হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে, এম.টি.এ.-র কর্মী-বাহিনীও রয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণকারী অথবা কানাডার অধিবাসীদের মধ্যে যারা জলসায় যোগ দিতে পারেনি, তাদের যেভাবে এদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, একইভাবে সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী আহমদীদেরও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এম.টি.এ.-র অনেক কর্মী কানাডার স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী, কিছু স্থানীয় নিয়মিত কর্মী এবং কিছু কেন্দ্রীয় কর্মী লন্ডন থেকে এসেছিল। তারা সবাই জলসার তিন দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে জলসার অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। যেভাবে আমি বলেছি, লন্ডন থেকেও টীম এসেছিল। এর কারণ, যেখানেই আমি যাই, তারাও আমার সাথে যায়। ভাড়া করার পরিবর্তে এম.টি.এ.-র কেন্দ্রীয়-টীম একটি ডিশও আপলিঙ্কের জন্য এবার সাথে নিয়ে এসেছিল। ফলে অনেক উপকার হয়েছে এবং সময়ের দিক থেকেও আমরা স্বাধীন ছিলাম। কেননা, ভাড়ায় নিলে সময়ের বাধ্যবাধকতা থাকে আর সময় বেশি নিলে অতিরিক্ত মূল্যও পরিশোধ করতে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মোটের উপর আমাদের ১০/১৫ হাজার ডলার সাশ্রয় হয়েছে।

অতএব, সকল বিভাগের কর্মীরা নিজ নিজ বিভাগে যে দায়িত্বই পালন করেছে, এর জন্য জামা'তের সদস্যদের উচিত, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অনুরূপভাবে, কর্মীদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে এই সেবা করার সুযোগ দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে আমি তোমাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি করব এবং আমার অন্যান্য নেয়ামত-রাজিও দান করব। আল্লাহ্ তা'লা যখন লাআযিদান্নাকুম বলেন, তখন কোন বিষয়কে তিনি আর সীমাবদ্ধ রাখেন না। আল্লাহ্ তা'লা যখন দান করেন,তখন অশেষ দানে ভূষিত করেন আর সকল অর্থে মানুষকে নিয়ামতে ধন্য করেন। অতএব, মু'মিনদের রীতি হল, সকল প্রকার সফলতা লাভের পর সকল ভালো বিষয়ের জন্য খোদা তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞ হওয়া আর যেখানেই দুর্বলতা দেখবে, সেখানে খোদার করুণা ভিক্ষা চাওয়া এবং ইস্তেগফার করা।

বড় বড় ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা থেকেই থাকে। কিন্তু দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করে সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাজের জন্য অতিথিদের প্রশংসার কারণে সকল কর্মীর উচিত আপন-পর সকল অতিথির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। যেহেতু দুর্বলতার কথা এসেই গেছে, তাই উদাহারণ-স্বরূপ বলছি, জলসার প্রথম দিন আতিথেয়তা বিভাগ উপস্থিতির সঠিক অনুমান করতে পারে নি। যদিও এক দিন পূর্বেই আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমরা ২২ হাজার মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করব, এত লোকের উপস্থিতি আমরা প্রত্যাশা করছি। অথচ খাবার রান্না করা হয়েছে ২০ হাজার মানুষের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের নিজস্ব হিসাব অনুসারে প্রায় দুই হাজার মানুষ খাবার পায় নি আর এর জন্য তারা ক্ষমাও চেয়েছেন। কিন্তু অতিথিরাও জলসা শোনার মানসে এসেছিলেন, তাই সেদিন অথবা পরের দিনও যদি খাবারে ঘাটতি পড়ে থাকে, তাহলে অনেকেই তা হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন আর কোন অভিযোগও করেননি। বরং কিছু লোক তো অন্যদের সংশোধনের কারণ হয়েছেন।

এক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন যে, খাবারের জন্য দীর্ঘ লাইন ছিল। প্রথমে বলা হয়, খাবার শেষ, পুনরায় আনা হচ্ছে, অপেক্ষা কুরুন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলা হয়, খাবার শেষ হয়ে গেছে, এখন আর আসবে না। তিনি বলেন, এই কথা শুনে ব্যবস্থাপনার উপর আমার খুব রাগ হচ্ছিল, আমি খুবই রাগান্বিত ছিলাম। ঠিক তখনই তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, খাবার শেষ হয়ে গেছে। আমি তাকে বলি, এ কী বলছেন আপনি? সেই ব্যক্তি বলেন, আমার কাছে শুকনো রুটির কয়েকটি টুকরো আছে। আসুন, এখন আমরা এগুলো পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নেই। যদি খাবার পেতাম, তাহলে এ সুন্নত পালন করা আমাদের জন্য সম্ভব হতো না। চলুন! আজ আমরা এই সুন্নতের উপরও আমল করি। সেই পত্র লেখক আমাকে লিখেছেন যে, এটি দেখে আমার রাগই শুধু দূর হয় নি, বরং আমি এ কথা ভেবে লজ্জিত হই যে, কেন আমি রাগ করলাম। পরে এ বিষয়টি ভেবে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে যাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা কত উন্নত চরিত্রের মানুষ দান করেছেন।

অতএব, ব্যবস্থাপনারও উচিত এ সব অতিথির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যারা এত উন্নত আচরণ প্রদর্শন করেছেন। এবার ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে একটি ভালো দিক সামনে এসেছে আর তা হল, নিজেদের দুর্বলতার কথা গোপন রাখার পরিবর্তে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন এবং তা প্রকাশও করেছেন। কিন্তু এতটাই যথেষ্ট নয়, বরং জলসার ব্যবস্থাপনার কাছে যে রেড বুক বা লাল খাতা আছে, তাতে এখন আপনারা এ সবকিছুই লিপিবদ্ধ করুন এবং ভবিষ্যতের জন্য আরো ভালো পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন। একইসাথে আমি আরো বলতে চাই যে, এখন মনে হচ্ছে, বাহ্যত এ জায়গায় সর্বোচ্চ ১৮/১৯ বা ২০ হাজার মানুষের সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব, এর বেশি নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত এখন বড় হচ্ছে। কাজেই, স্থানীয় জামা'তকে এখন আরো বড় জায়গার জন্য চিন্তা করা উচিত, অথবা অন্ততপক্ষে কখনো যদি আমাকে জলসায় আনতে চান, তাহলে এ জায়গা আর কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়, তাই এ সম্পর্কে অবশ্যই চিন্তা করুন।

ব্যবস্থাপনা নিজেদের যেসব দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেছেন, তা আমি জানিয়ে দিচ্ছি। এগুলোর মধ্য থেকে কোন কোন বিষয়ের অভিযোগ পূর্বেই আমার কাছে করা হয়েছিল, তাই তা সঠিকই হবে। এছাড়াও যদি আরো কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকে, তাহলে লোকেরা তা নিজেও ব্যবস্থাপনাকে লিখিত ভাবে জানাতে পারে, যেন ভবিষ্যতে আরো উত্তম ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

তারা প্রথম যে কথাটি লিখেছেন তা হল, আরব অতিথিদের খাবারের মান সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে, তাদের খাবারে ঝাল বেশি ছিল, যা তাদের রুচি সম্মত ছিল না। কাজেই, এটি সংশোধন করতে হবে। এরপর তারা খাবারের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছে, যা আমি পূর্বেই আপনাদেরকে বলেছি। এরপর পুরুষদের খাবার এক ঘন্টা বিলম্বে পৌঁছেছে। প্রথম কথা হল, দূরত্ব অনেক বেশি। খাবার এখানে (অর্থাৎ, পীস ভিলেজে) রান্না করে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে নিয়ে যেতে হয়, এরপরও খাবারের ট্রাক

সকল বিভাগের কর্মীরা নিজ নিজ বিভাগে যে দায়িত্বই পালন করেছে, এর জন্য জামা'তের সদস্যদের উচিত, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অনুরূপভাবে, কর্মীদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে এই সেবা করার সুযোগ দান করেছেন।

ভুলবশত পুরুষদের অংশের পরিবর্তে মহিলাদের অংশে চলে যায়, যার ফলে পুরুষদেরকে কষ্ট সহ্য করতে হয়। যাহোক, পুরুষদের কিছুটা কষ্ট হলেও কোন অসুবিধা নেই। মহিলা এবং শিশুদের ক্ষুধার্ত রাখা উচিত নয়। এ দিক থেকে ভালো হয়েছে যে, খাবারের ট্রাক সেখানে চলে গেছে।

ব্যবস্থাপনা আরো বলেছেন, খাবার রান্নার ক্ষেত্রে কর্মী স্বল্পতা ছিল। এটি পূর্ণ করা জামা'তের কাজ। জামা'তের মাঝে কর্মী বাহিনীর কোন অভাব নেই। ব্যবস্থাপনাকে শুধু এটি দেখতে হবে যে, নিজেদের পছন্দের লোক নয়, বরং সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ মানুষকে আমাদের নিতে হবে। অতএব, এমন মানসিকতায় পরিবর্তন আনুন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেবা করার প্রেরণা সমৃদ্ধ কর্মী আহমদীয়া জামা'তে অনেক আছে। জলসা গাহের শৌচাগারসমূহ ব্যবহারের জন্য মানুষকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে মানুষের অভিযোগও রয়েছে আর ব্যবস্থাপনাও তা অনুভব করেছে। বরং আমার কাছেও কিছু অভিযোগ এসেছে। আর তাতে বলা হয়েছে, শুধু অপেক্ষাই করতে হয়নি, বরং অসুস্থ্য এবং অন্য অনেক মানুষকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর একদিন পূর্বে আমি বিশেষভাবে এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম যে, এর সঠিক ব্যবস্থা রয়েছে কি-না? আমাকে যা বলা হয়েছিল, সে অনুসারে আমার মনে হয়, সঠিক ব্যবস্থা ছিল না। যাহোক, ভবিষ্যতে সেখানে যদি স্থায়ী ব্যবস্থা না-ও থাকে, তাহলে সাময়িক ব্যবস্থা হাতে নিতে হবে।

এছাড়া লঙ্গরখানা বা পাকশালায় অডিও-ভিডিওর ব্যবস্থা ছিল না, এটি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, যে সব কর্মী জলসা শুনতে জলসা গাহে যেতে পারে না, তাদের জন্যেও জলসা শোনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তারা আরো জানিয়েছেন, পুরুষদের অংশের পিছনের দিকে আওয়াজ স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আমার খুতবা বা বক্তৃতার সময় আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমার বক্তৃতার আওয়াজ খুব স্পষ্ট ছিল। আমাকে যা বলা হয়েছে, তা যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে যারা পিছনে বসেছিলেন, তাদের উচিত আমাকে জানানো। কেননা, আমার জানা মতে প্রথমে আওয়াজ ঠিক ছিল না। পরবর্তীতে আমাদের কয়েকজন কর্মী তা ঠিক করার চেষ্টা করেছে।

অনুরূপভাবে আরবদের জন্য অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাদেরকে তা জানানো হয়নি। আমার সাথে কোন কোন আরবের সাক্ষাৎ হয়েছে, তারা আমাকে বলেছেন, প্রথম দিন আমরা খুতবা শুনতে পারি নি। পরের দিন তারা জানতে পেরেছেন। অথচ ব্যবস্থাপনার এতটা অভিজ্ঞতা তো থাকা উচিত যে, অনুবাদের জন্য বারবার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে, সে বিষয়ে ঘোষণা করা যে, অমুক জায়গা থেকে নিজ নিজ ভাষার অনুবাদ সহায়ক যন্ত্র সংগ্রহ করুন। এছাড়াও এ কথা বোর্ডে এবং প্রবেশদ্বারেও লিখে রাখা উচিত।

এখন আমি অতিথি এবং পত্র-পত্রিকার কিছু অভিব্যক্তি বা মন্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব, যা পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি এভাবে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে যে, মানুষের হৃদয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে প্রভাব ফেলেন। ফলাফলের তুলনায় আমাদের প্রচেষ্টা কিছুই না।

প্রথমে আমি কতিপয় সিরিয়ান আরব আহমদী বন্ধুর অভিব্যক্তি উপস্থাপন করছি। তারা এইবারই প্রথম এত বড় জলসায় অংশগ্রহণের এবং স্বাধীনভাবে ইবাদত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।কেননা, সেখানে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। যখন পরিস্থিতি ভালো ছিল, তখনো ইবাদতের স্বাধীনতা ছিল না। আর অবস্থার অবনতির পর তো কয়েক বছর যাবৎ-ই তারা পিষ্ট হচ্ছিলেন।

একজন আহমদী বন্ধু আহমদ দরবেশ সাহেব বলেন, এটি ছিল আমার প্রথম জলসা। জলসাগাহে প্রবেশের পর যখন যুগ খলীফার উপস্থিতি দেখলাম, তখন আমার মনে হল, আমি ইসলামে প্রবেশ করছি। তিনি বলেন, আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে আর সেই পরিবর্তনটি হল, আমার নামায পরম বিনয় এবং আকুতি-মিনতিতে ভরে গিয়েছে। অতএব, এটি সেই পরিবর্তন, যা জলসায় অংশ নেয়া প্রতিটি আহমদীর মাঝে আসা উচিত, আর তা শুধু সাময়িকভাবে নয়, বরং স্থায়ীভাবে হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি সিম্পসন (ঝরসঢ়ংড়হ) নামের একজন কানাডিয়ান অতিথিকে সাথে নিয়ে এসেছিলাম। তিনি সস্ত্রীক এসেছিলেন আর পূর্বে তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন, এখন নাস্তিক হয়ে গেছেন। জলসায় অংশগ্রহণের পর তিনি বলেন, আমি আমার জীবনে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত এমন নিষ্ঠাপূর্ণ ও সত্য কথা কখনোই শুনি নি। এমন ইসলাম সম্পর্কে অবগত হয়ে আমি খুবই আনন্দিত। আল্লাহ্ করুন, এই আনন্দ যেন তার হৃদয়ের দ্বার খোলার কারণও হয়।

অনুরূপভাবে, এক সিরিয়ান আহমদী আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, জলসা সালানার তিন দিন এমন ছিল, যা সারা জীবনেও ভুলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জামা'তের হাজার হাজার মানুষ এবার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনাসহ কানাডায় সমবেত হয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন,

জলসার ব্যবস্থাপনা, অভ্যর্থনা এবং প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতুলতা, এমনকি বাচ্চাদের খেলাধূলার ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা করা, এক কথায় অসাধারণ ছিল। জলসার পরিবেশ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল। হাজার হাজার মানুষকে ডাকা, তাদের পরিবহন এবং খাবারের ব্যবস্থা করা, এটি একটি অসাধারণ বিষয়। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন বক্তৃতা এবং সেগুলোর অনুবাদ করা আর অনুবাদের বিভাগও অনেক ভালো ছিল। তিনি বলেন, আমি সাংবাদিকদের একটি দল এবং একটি মুসলমান পরিবারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তারা সবাই জলসার উন্নত ব্যবস্থাপনা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। বিশেষ করে, আমার শেষ দিনের বক্তৃতা তারা খুব পছন্দ করেছেন। আর নিজেদের ইমামের প্রতি আহমদীদের ভালোবাসা এসব অতিথিদের জন্য অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয় ছিল।

অনুরূপভাবে, আব্দুল কাদের সাহেব বলেন, আমি প্রথমবার দেখলাম, জলসার ব্যবস্থাপনা কত ব্যাপক হয়ে থাকে আর প্রতিটি কর্মী কোন প্রকার হৈচৈ ও সমস্যা সৃষ্টি ছাড়াই মৌমাছির মত কাজ করতে থাকে। খেদমতের জন্য সবাই সুযোগ খুঁজছিল। বিশেষ করে, যখন তারা বুঝতে পারত আমি একজন আরব, তখন তারা আমার সাথে অসাধারণ শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করত।

এরপর এ.করীম মোস্তফা সাহেবা বর্ণনা করেন, এত বড় জনসমাগম সত্ত্বেও জলসা খুবই সুশৃঙ্খল ছিল। সেই আধ্যাত্মিকতাকে আমি সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছি, যার বহিঃপ্রকাশ মানুষের চেহারায় হচ্ছিল। খোদা করুন, এই আধ্যাত্মিকতা যেন সর্বদা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। আমরা সেই সব লোকের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা জলসার এই সফল আয়োজন, বক্তৃতার অনুবাদ এবং অন্যান্য কাজে অংশ নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এরপর সালমা জুবিলী সাহেবা বলেন, জলসার শৃঙ্খলা এবং ব্যবস্থাপনা দেখে বলা যেতে পারে, জামা'ত একটি দেহের মত ঐক্যবদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুগঠিত। আমরা পরিবহন বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাদেরকে জলসায় আনা-নেয়ার সুব্যবস্থা করেছেন। জলসায় বিভিন্ন দেশ, জাতি এবং বর্ণের মানুষ সমবেত হয়ে শুধু একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্যই কাজ করছিলেন আর তা হল, ইসলাম এবং শান্তির বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানো।

হোসাইন আবেদীন সাহেব বর্ণনা করেন, জলসা সালানায় অতিবাহিত মুহূর্তগুলো আমার জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্ত ছিল। টেলিভিশনে আমি বিভিন্ন জলসা দেখতাম এবং দোয়া করতাম, হে আল্লাহ্! কখনো আমিও যদি যুগ খলীফার সাথে জলসায় যোগ দানের সুযোগ পেতাম। কিন্তু আমি জানতাম না, আমার এ দোয়া এত দ্রুত গৃহীত হবে এবং আমি যতটা চেয়েছি, আল্লাহ্ তা'লা তার চেয়ে বেশি আমাকে দান করবেন। জলসা সালানায় আমি স্টেজের সামনে বসেছিলাম। এমতাবস্থায়, সেই কঠিন দিনগুলোর যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তের কাহিনী আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, যে কঠিন পরিস্থিতি আমি সিরিয়া এবং তুরস্কে অতিবাহিত করেছি। তখন আমার হৃদয় খোদার কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় এবং আমি বলি, এক ছিল সেই যন্ত্রণাদায়ক দিন আর এই হল আজকের এ দিন, যেদিন আমি যুগ খলীফার সামনে বসে আছি। এটি খোদা তা'লার কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একজন সিরিয়ান বন্ধুর নাম ফারায সাহেব। তিনি বলেন, এবারই প্রথমবারের মত আমি জামা'তের কোন জলসায় যোগদান করেছি। এত মানুষ দেখে আমি ভীতি অনুভব করি। (খুব সম্ভব অনুবাদক ভীতি শব্দটি লিখেছেন, আসলে তিনি বিস্মিত ছিলেন আর আমার ধারণা ভালোবাসাপূর্ণ শব্দই তিনি ব্যবহার করেছেন।) আর এরা শুধু কানাডারই নন, বরং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন। এছাড়া তারা কোন এক জাতির সাথেও সম্পর্কযুক্ত নন, বরং বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। একইভাবে, জলসায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা উপস্থিত লোকদের মেনে চলা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা, সত্যিই ঈমান উদ্দীপক বিষয় ছিল। আমার জন্য সবচেয়ে আনন্দায়ক বিষয় ছিল, খলীফাতুল মসীহ্‌র উপস্থিতি এবং তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, যা থেকে আমি তিন দিনই কল্যাণমন্ডিত হয়েছি।

যাহোক, এই ছিল এমন কয়েকজন আহমদীর ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ, যারা নতুন ও পুরাতন আহমদী এবং পরিস্থিতির শিকার হয়ে সিরিয়া থেকে হিজরত করে এখানে এসেছেন।

এখন কিছু অ-আহমদীর ভাবাবেগও আমি তুলে ধরছি। এদের মাধ্যমেও জামা'তের পরিচিতি এবং তবলীগের পথ উন্মোচিত হয়।

জার্মান কনসুলেট আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, চার সপ্তাহ পূর্বে আমি এখানে এসেছি।তিনি জামা'তের সাথে খুব একটা পরিচিত নন। বিভিন্ন দেশে তিনি কাজ করেছেন। তিনি বলেন, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে এমন পরিপূর্ণ শিক্ষা সম্বলিত বক্তৃতা আমি আজ পর্যন্ত শুনি নি (তিনি আমার শেষ বক্তৃতাটি শুনেছিলেন)। আমি দেখেছি, আপনার দৃষ্টিভঙ্গী খুবই ইতিবাচক। তিনি আমার সম্পর্কে বলেন, প্রকৃত ইসলামকে আপনি তুলে ধরেছেন, যা শান্তি, ন্যায়বিচার এবং ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। প্রতিটি শব্দে সত্য ফুঁটে উঠছিল। হায়! পৃথিবীর প্রচার মাধ্যমগুলো ইরাকের বাগদাদী এবং আইসিসের অপপ্রচার উপস্থাপনের জন্য যতটা সময় ব্যয় করে, তা যদি এই শান্তির দূতের জন্য ব্যয় করত, তাহলে পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতো। তিনি বলেন, তাঁর প্রতিটি বাক্য সত্য-ভিত্তিক ছিল আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাতে এক বেদনা ছিল। যতটা সম্ভব আমি এ বাণী প্রচার করব। এভাবে অ-আহমদীরাও আল্লাহ্‌র কৃপায় আমাদের দূত হিসেবে কাজ করে।

জুডি সাহেবা নামের একজন সাংসদ, তাকে স্থানীয় আহমদীরা চেনেন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি অনুসারে তোমাদের খলীফা তোমাদের উপর একটি গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন আর তা হল, 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এই বাণী পৃথিবীতে প্রচার করা। আর তার চেয়েও বড় দায়িত্ব হল, মুসলিম ও অমুসলিম সবাই যেন ভালোবাসার ভিত্তিতে সম্পর্ক দৃঢ় করে এবং ইনসাফ তথা ন্যায়-বিচার ও

নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করে। এমনটি যদি না হয়, তবে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে, আর এটি পরিষ্কার প্রতিভাত হচ্ছে। সাধারণ জনতা এবং রাজনীতিবিদ, উভয় পক্ষকেই সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে, যার ফলে পৃথিবীতে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, আমাদের মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে এ বাণী অন্যের কাছে পৌঁছাতে হবে, মানুষ যেন বুঝতে পারে, উগ্রপন্থী দলগুলোর অপকর্মের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। চরমপন্থী এই মানুষগুলো তাদের হীণ স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যেই অন্যদের দুর্নাম করছে।

সেভেন্থ ডে এভেঞ্জেলিষ্ট চার্চের সাথে সম্পর্ক রাখেন, এমন একজন অতিথি এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজ আমার হৃদয় অত্যন্ত আনন্দিত, কেননা খলীফাতুল মসীহ্ তাঁর বক্তৃতায় শান্তি এবং নিরপত্তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এখন মানুষের উচিত জামা'তে আহমদীয়াকে চেনা এবং জামা'তে আহমদীয়া যে কাজ করছে, তা জানা। প্রচার মাধ্যমগুলো যাদেরকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে, তারা মুসলমান নয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তো অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ।

বেলীয থেকে সেখানকার একজন স্থানীয় মেয়র এসেছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যেও এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনার বক্তৃতা আমার উপর সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর আপনি যেভাবে আলোকপাত করেছেন, তা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে, খলীফাতুল মসীহ্ শুধু আহমদীদের জন্যই দিক-নির্দেশনা বা হেদায়াতের কারণ নন, বরং তিনি সমগ্র বিশ্বকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারেন। খলীফাতুল মসীহ্ তাঁর বক্তৃতায় যে সব কথা বলেছেন, তা আমি কখনোই ভুলতে পারব না।

আরেকজন মেহমান হলেন এখানকার স্থানীয় মেয়র সাহেব। জামা'তকে তিনি এই বার্তা দিচ্ছেন যে, আমাদের জন্য এটি একটি বিশেষ মুহূর্ত, কেননা, আমরা এ বাণী প্রাপ্ত হয়েছি যে, ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে হবে এবং সবার সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, খলীফা আপনাদেরকে বলেছেন, 'পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর।' আমাদের সবার উচিত, আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব এবং নিজেদের ভূমিকা পালন করি।

ব্রামটন থেকে আগত এক মেহমান বলেন, আমার জন্য জলসায় শুধু একটি বার্তাই ছিল আর তা হল, শান্তি প্রতিষ্ঠা কর।

আরেকজন মেহমান, যিনি আমার শেষ বক্তৃতা শুনেছেন। তিনি বলেন, এটি একটি বিস্ময়কর বক্তৃতা ছিল। আমার কাছে সে অনুভূতি প্রকাশের কোনভাষা নেই।

একজন মহিলা সাংসদ ইয়াসমিন আতনাসী সাহেবা বলেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদানকৃত বক্তৃতায় খলীফার বার্তা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে এ কথাটি যে, একজন মা একটি পরিবারের ভিত্তি হয়ে থাকেন এবং পুরো সমাজকে তিনি দৃঢ়তা দান করেন।

একজন ভদ্র মহিলা ম্যারি লিন সাহেবা বলেন, এটি আমার নবম জলসা। তথাপি আমি আপনাদের খলীফার বক্তৃতা শোনার জন্য ব্যাকুল ছিলাম এবং অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি আরো বলেন, এখানে আমি সবাইকে পরস্পরের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে দেখেছি এবং সবাই এই জলসার গুরুত্বও অনুধাবন করছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খুবই উন্নত ছিল, সাউন্ড সিস্টেমও ভালোভাবে কাজ করছিল এবং ভিডিও মনিটরও উন্নতমানের ছিল। অনুবাদের জন্য হেড সেটের ব্যবহার দেখে আমি আনন্দিত ছিলাম। কেননা, এছাড়া আমাদের জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য সফল হতো না এবং জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের কথা বুঝতে পারতাম না। তিনি বলেন, অতিথিদের সাথে যথারীতি আপনারা অনেক নম্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে থাকেন, যদিও আমরা সবাই এর যোগ্য নই। এ জন্য আমরা আপনাদের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। হাজার-হাজার আহমদীকে শান্তি এবং ভালোবাসার চেতনায় সমৃদ্ধ দেখে আমরা খুবই প্রভাবিত। এ দৃশ্য ইউরোপ এবং আরবে বিরাজমান অনৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জলসায় উপস্থিত লোকদের ঐকতান দেখে আমি সত্যি অভিভূত।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপায় জলসা সালানায় আগত অতিথিবৃন্দ ভালো ইম্প্রেশন নিয়েই ফিরে যান। বহির্বিশ্ব থেকেও কিছু মেহমান এসেছিলেন। দু'একজনের কথা আমি উল্লেখ করেছি। তারা খুব ভালো ইম্প্রেশন বা প্রভাব নিয়ে ফিরে গেছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা এবং মধ্য আমেরিকার মানুষ আমাদের এ জলসায় যোগদানের জন্য এসে থাকেন। আর তারা যখন জলসার পরিবেশ দেখেন, তখন তাদের মাঝে থাকা ইসলাম সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর হয়ে যায়। এসব দেশে আমাদের জামা'ত যেহেতু সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই সেখানে অল্প কিছু আহমদী রয়েছে,যারা মাত্র কয়েক বছর অর্থাৎ দু'তিন বছর পূর্বে বয়আত করছেন এবং নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, তাদের কিছু সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই, উচ্চপদস্থ কিছু কর্মকর্তার জলসায় যোগদানের কারণে এবং প্রকৃত সত্য প্রত্যক্ষ করার ফলে সেখানে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যায় এবং তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। এ সব দেশের বেশির ভাগ মানুষ যুক্তরাজ্যের জলসায় আসে। কিন্তু এখানেও কিছু মানুষ এসেছিলেন। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও জলসা তবলীগের পথ সুগম করে। মোটকথা, জলসা সালানা আমাদের নিজেদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করার পাশাপাশি অ-আহমদীদের জন্যও জামা'তের সাথে পরিচিত হওয়ার এবং সম্পর্ক দৃঢ় করার কারণ হয়। এর ফলে ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ অবহিত হয়।

কিছুকাল থেকে মুসলিম দেশসমূহে বিরাজমান পরিস্থিতি এবং এ কারণে পৃথিবীর যে চিত্র সামনে আসছে, তা প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টিকেও জামা'তে আহমদীয়ার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল, এটি খোদা তা'লার ফযল যে, তিনি তাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করেছেন। কেননা, আগে তো ডাকা সত্ত্বেও তারা আসতো না। তথাপি আমাদের যুবকদেরও এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, যারা প্রচার মাধ্যমের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা বৃহত্তর পরিসরে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। কানাডার মিডিয়া টীম, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ যুবক-শ্রেণি, তারা কঠোর পরিশ্রম করে প্রেস

> জলসায় অংশগ্রহণকারী সকল শ্রোতা আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখুন যে, জলসায় যা কিছু শুনেছি, সেগুলোকে আমরা নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা বৈশিষ্ট্য করে নেয়ার চেষ্টা করছি কি-না ? এছাড়া এর প্রতি দৃষ্টি রাখুন যে, কিভাবে পুন্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় এবং এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখা যায়। আর এটি যেন সাময়িক কৃতজ্ঞতা না হয়ে খোদার প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হয়।

এবং প্রচার মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ দৃঢ় করেছে। আমার ধারণা ছিল না যে, কানাডাতেও আমাদের যুবকেরা এতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এখানে এসে দেখার পরই আমি জানতে পেরেছি যে, মাশাআল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুবকেরা কঠোর পরিশ্রম করছে। অধিকাংশ লোককে আমি এ ক্ষেত্রে কাজ করতে দেখেছি। অতএব, এটিও এক প্রকার তবলীগ, যা প্রচার মাধ্যমের সুবাদে আমাদের যুবকেরা করে চলেছে। তাদের মাঝে অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিরাজমান। অনেক বড় বড় পত্রিকা এবং টিভি ও রেডিও চ্যানেলের সাথে তারা যোগাযোগ করেছে। কোন কোন চ্যানেল বেশ ভালো সাড়া দিয়েছে, আবার কোন কোন চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ বলেছে, ধর্মের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নেই, তাই তোমাদের জলসার সংবাদ আমরা প্রচার করতে পারব না বা তোমাদের খলীফা আসলেও তা নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। কাজেই, আমরা কভারেজ দিতে পারব না। এ কথা শুনে কিছু যুবক কিছুটা উৎকণ্ঠাও বোধ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও তাদের ঈমানকে দৃঢ় করার দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং তাদের ঈমানকে আরো মজবুত করার উপকরণ সৃষ্টি করেন। যেমন,একটি পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা অনাগ্রহ প্রদর্শন করে। এক সিরিয়ানও উল্লেখ করেছেন, আমি সাংবাদিক নিয়ে এসেছি। সম্ভবত এটিই সেই সাংবাদিক টীম, যাদের সম্পর্কে সেই যুবক চাচ্ছিল যে, এই চ্যানেল যেন অবশ্যই তাদের প্রতিনিধিকে জলসায় পাঠায়, যদ্বারা আহমদীয়াত এবং ইসলামের সঠিক বাণী ও পয়গাম জাতির কর্নগোচর হয়। কাজেই, যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কাজ করে থাকেন, সম্ভবত এই চ্যানেলটি সিরিয়ান শরণার্থীদের উপর কোন প্রামান্য চিত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা করছিল। তাই তারা যখন সিরিয়ান শরণার্থীদের সন্ধানে বের হয়, তখন ঘটনাচক্রে বা বলা উচিত খোদা তা'লার ইচ্ছা বা বিধাতার অমোঘ সিদ্ধান্ত অনুসারে যেসব সিরিয়ানের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে, তারা আহমদী ছিলেন। তারা সাংবাদিকদেরকে বলেন, আমাদের জলসা হচ্ছে, সেখানে আসুন, সব কিছু সেখানেই জানতে পারবেন আর সেখানেই কথা হবে। অতএব, এভাবে সেই প্রচার মাধ্যমকেও আসতে হয়েছে, যারা পূর্বে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল।যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোন মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে জামা'তকে পরিচিতি দান করছেন। আর আজকাল পৃথিবীতে প্রচার মাধ্যমের যে ভূমিকা, তাতে আহমদীয়া জামা'ত ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করছে। এক্ষেত্রে যে সব আহমদী স্বেচ্ছাসেবকের চেতনা নিয়ে কাজ করে চলেছেন, তাদেরকেও আমি বলব, তারা যেন আরো অধিক পরিশ্রম ও বিনয়ের সাথে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। সর্বদা এই প্রকৃত সত্যটি স্মরণ রাখবেন যে, খোদার ফযল সব সময় আমাদের সাথী হয়ে থাকে আর সর্বদা সেই ফযলেরই অন্বেষণ করা উচিত।

পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনসহ প্রচার মাধ্যমের কিছু মানুষ জলসার প্রথম দিন অর্থাৎ, জুমুআর দিন এসেছিল, ছোট একটি সংবাদ সম্মেলনও হয়েছে, তারা আমার ইন্টারভিউ নিয়েছে, এরও ভালো কভারেজ দেয়া হয়েছে। সেখানে জামা'তের পরিচিতি এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। আমি তাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আমার চেষ্টা থাকে, তারা যে প্রশ্নই করুক না কেন, তা চলমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত কথা হোক বা জামা'তে আহমদীয়া সম্পর্কে কোন প্রশ্ন, আমি সেটিকে কোন ভাবে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেই, যেন ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারে।

যাহোক, প্রচার মাধ্যম জলসার যে কভারেজ দিয়েছে, তার সারসংক্ষেপ হল, কানাডার সবচেয়ে বড় তিনটি পত্রিকা 'টরন্টো স্টার', 'দি গ্লোব এন্ড মেইল' এবং 'ন্যাশনাল পোষ্ট' ব্যাপক পরিসরে জামা'তের সংবাদ প্রচার করেছে। স্থানীয়জামা'তের ধারণা অনুসারে ৩.৯ মিলিয়ন বা ৩৯ লাখ মানুষ পর্যন্ত এ বাণী পৌঁছেছে। এই তিনটি বড় পত্রিকা ছাড়াও ২৫-এর অধিক অন্যান্য বড় পত্রিকার মাধ্যমে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ পর্যন্ত এ বাণী পৌঁছেছে। উর্দূর ৮টি, পাঞ্জাবীর ১০টি, স্পেনিশ, আরবি এবং বাংলা ভাষার ৩টি করে পত্রিকার মাধ্যমে ৩ লক্ষাধিক মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। কানাডার সবচেয়ে বড় রেডিও স্টেশন '680News'-এর মাধ্যমে ২.৫ মিলিয়ন বা ২৫ লক্ষ শ্রোতার কাছে জলসার সংবাদ পৌঁছেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যাতে টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ফেইসবুক এবং পেরিস্কোপ অন্তর্ভুক্ত, এগুলোর মাধ্যমে

তাদের মতে প্রায় ২০ লক্ষাধিক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। সি টিভি, গ্লোবাল টিভি, সিটি টিভি, রোজেস টিভি এবং সি. বি. সি. সহ ১৬টির অধিক প্রধান টেলিভিশ চ্যানেল জলসার বক্তৃতার বরাতে সংবাদ প্রচার করেছে। তাদের মতে,এর মাধ্যমে ২৫ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছেছে। উর্দূ, পাঞ্জাবী, বাংলা, ঘানীয়ান এবং অন্যান্য ভাষায় টেলিভিশনে জলসার সংবাদ ১ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে। যাহোক, মোটের উপর টেলিভিশনের কল্যাণে ৬.৬ মিলিয়ন বা ৬৬ লাখ মানুষ পর্যন্ত, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ২.৮ মিলিয় বা ২৮ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত, রেডিও-র মাধ্যমে ৩.৫ মিলিয়ন বা ৩৫ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এবং সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ২.৮ মিলিয় বা ২৮ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছেছে। মোটের উপর তাদের ধারণা হল, ১৬ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এ বার্তা পৌঁছেছে। খুব সাবধানতার সাথেও যদি ধরা হয়, তাহলে অন্তত পক্ষে ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি মানুষ পর্যন্ত জামা'তের পরিচিতি ও বার্তা জলসার বরাতে পৌঁছে থাকবে। প্রচার মাধ্যমে আমি যে সব খবর দেখেছি এবং শুনেছি, তারা খুবই সততার সাথে জামা'ত এবং জলসা ও আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করেছে।

অতএব, এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ, যা তিনি করে চলেছেন। অর্থাৎ, বিশ্ব-দরবারে জামা'ত পরিচিত হচ্ছে। কিন্তু একই সাথে এটি আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ যে দিকে আকর্ষণ করে, তা হল, এ সব দেখে কেবল আত্মপ্রসাদ নিলেই চলবে না, বরং আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। প্রত্যেক সেই কথাকে অপছন্দ করা উচিত, যা আল্লাহ্ তা'লা অপছন্দ করেন আর প্রত্যেক সেই কাজ করা উচিত, যা করার জন্য আল্লাহ্তা'লা পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা যদি সেবা করার সুযোগ দিয়ে থাকেন, সেটিকে খোদার কৃপা জ্ঞান করুন। সকল পদধারী কর্মকর্তা এবং সেবক তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করুন। আর জলসায় অংশগ্রহণকারী সকল শ্রোতা আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখুন যে, জলসায় যা কিছু শুনেছি, সেগুলোকে আমরা নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা বৈশিষ্ট্য করে নেয়ার চেষ্টা করছি কি-না? এছাড়া এর প্রতি দৃষ্টি রাখুন যে, কিভাবে পুণ্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় এবং এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখা যায়। আর এটি যেন সাময়িক কৃতজ্ঞতা না হয়ে খোদার প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হয়।

অতএব, এ বিষয়টিকে সর্বদা সামনে রাখুন। আর এর কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপাবারির মাত্রা বর্ধিত করেন এবং স্বীয় দানে ভূষিত করেন। এমন প্রতিটি আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা এ সমস্ত কথা মেনে চলার তৌফিক দিন, যারা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্ তা'লাকে চেনে এবং তাঁর সাথে দৃঢ়-সম্পর্ক রাখে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ নভেম্বর, ২০১৬ থেকে ১০ নভেম্বর, ২০১৬)
(কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি, কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাই-বা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

জুমুআর খুতবা

ছিদ্রান্বেষণ না করে বরং অভিযোগ করার সঠিক রীতি অবলম্বন করুন

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ০২ ডিসেম্বর, ২০১৬ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কতক পদধারী কর্মকর্তা বা যারা পদধারী নয়, এমন মানুষের বিরুদ্ধে অনেক মানুষ অভিযোগ করে বলে যে, এরা এমন, এরা তেমন। এই ব্যক্তি অমুক অপরাধ করেছে আর সে শরীয়ত বিরোধী অমুক অপকর্ম করেছে, তাই তাৎক্ষনিকভাবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কেননা, এরা জামা'তের দুর্নাম করছে। কিন্তু এমন অভিযোগকারীদের অধিকাংশই তাদের পত্রে নিজেদের নাম লিখে না আর লিখলেও ছদ্মনাম ও মনগড়া ঠিকানা লিখে তা পাঠিয়ে দেয়। এমন লোকদের অভিযোগে স্পষ্টতই কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না আর ব্যবস্থা নেয়া সম্ভবও নয়। এভাবে কিছুকাল কেটে যাওয়ার পর পুনরায় অভিযোগ আসে যে, আমি অভিযোগ করেছিলাম, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। যদি ব্যবস্থা নেয়া না হয়, তাহলে অনেক বড় অন্যায় হয়ে যাবে। এমন বেনামী-অভিযোগ করার ব্যাধি পাক-ভারতের লোকদের মাঝে বেশি দেখা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ খুব কমই এসে থাকে। কিন্তু বহির্বিশ্বের দেশসমূহে বসবাসকারী পাকিস্তানীদের অনেকের মাঝেও এই ব্যাধি রয়েছে। অর্থাৎ, তারা এমন বেনামী-অভিযোগ করে থাকে। আর এটি

কতক পদধারী কর্মকর্তা বা যারা পদধারী নয়, এমন মানুষের বিরুদ্ধে অনেক মানুষ অভিযোগ করে বলে যে, এরা এমন, এরা তেমন। এই ব্যক্তি অমুক অপরাধ করেছে আর সে শরীয়ত বিরোধী অমুক অপকর্ম করেছে, তাই তাৎক্ষনিকভাবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কেননা, এরা জামা'তের দুর্নাম করছে। কিন্তু এমন অভিযোগকারীদের অধিকাংশই তাদের পত্রে নিজেদের নাম লিখে না আর লিখলেও ছদ্মনাম ও মনগড়া ঠিকানা লিখে তা পাঠিয়ে দেয়। এমন লোকদের অভিযোগে স্পষ্টতই কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না আর ব্যবস্থা নেয়া সম্ভবও নয়।

নতুন কোন বিষয় নয়, সকল যুগেই এমন অভিযোগকারী লোক ছিল, যারা এমন অভিযোগ করত, যেভাবে আজকাল কেউ কেউ আমাকে লিখে থাকে। অনুরূপভাবে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে, খিলাফতে সালেসার যুগে এবং খিলাফতে রাবেয়ার যুগেও এমন অভিযোগকারী ছিল, যারা বেনামী অভিযোগ করত।

এমনই একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি খুতবা প্রদান করেছিলেন। যেহেতু, এ ধরণের লোকদের মুখ বন্ধ করার জন্য এটি একটি যথার্থ ও সুস্পষ্ট খুতবা, তাই সেই খুতবার আলোকে আমি আজকে কিছু কথা বলার জন্য মনস্থির করেছি।

যে সমস্ত অভিযোগকারী নিজেদের নাম লেখে না আর লিখলেও ছদ্মনাম লিখে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল, এরা হয় মুনাফিক বা কপট নয়তো মিথ্যাবাদী। তাদের মাঝে সৎসাহস ও সততা থাকলে তাদের কোন কিছুরই তোয়াক্কা করার কথা নয়। তারা তো এ অঙ্গীকার করে যে, নিজ প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং সম্মান উৎসর্গ করার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত থাকব। কিন্তু তাদের ধারণা অনুসারে যখন জামা'তের সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন আসে, তখন তারা নিজের নাম গোপন করা আরম্ভ করে, যেন কোথাও তাদের সম্মান ও মর্যাদার হানি না ঘটে। অতএব, যে ব্যক্তি সূচনাতেই দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে, তার বাকি মতামতও ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের কাছে কোন সংবাদ এলে তোমরা তা যাচাই করে দেখে নিও। আর প্রত্যেক বিবেকবান এ বিষয়টি জানে যে, যে কোন তদন্তের জন্য বক্তব্য উপস্থাপনকারীর বক্তব্য শুনা মাত্রই সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হতে পারে না আর হয়ও না। বরং দেখা হয়, যে ব্যক্তি অভিযোগ উত্থাপন করেছে, সে নিজে কেমন মানুষ, তার মাধ্যমেই তদন্ত শুরু হয়। প্রথমে তার সম্পর্কে এ তদন্ত হবে যে, সে সকল প্রকার অন্যায় থেকে পবিত্র কি না, সে নিজে কোন অপকর্মে লিপ্ত আর ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল নয় তো? অথবা এটি অনভিপ্রেত যে, সে নিজে ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল হবে আর অন্যদের উপর অপবাদ আরোপ করবে যে, অমুক ব্যক্তি এমন, তেমন। প্রায়শঃ দেখা যায় যে, অন্যের উপর যারা ভয়াবহ অপবাদ আরোপ করে, হোক সে কোন পদধারী কর্মকর্তা বা অন্য কেউ, এমন ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ আপত্তি অথবা খুব জোরালোভাবে আপত্তি তারা তখনই উত্থাপন করে, যখন দেখে যে, তাদের ব্যক্তি-স্বার্থ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে যাচ্ছে। অতএব, তদন্ত করার পূর্বে এটি দেখতে হয় যে, অভিযোগকারী কেমন, সে কি মু'মিন, নাকি ফাসেক? অভিযোগকারী সম্পর্কে কোন তথ্য না থাকায় এটিও বলা যায় না যে, সে কোন্ শ্রেণীর মানুষ। অবশ্য এটি সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কথা লিখে, যা জামা'তের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাহলে নিজস্ব রীতি অনুসারে সেটির তদন্ত করা হয়। অনুরূপভাবে, এটিও যদি জানা থাকে যে, অভিযোগকারী কে, তাহলে আমি যেভাবে বলেছি, প্রথমে সে ব্যক্তির নিজের আচার-আচরণ সম্পর্কে তদন্ত হবে। অনুরূপভাবে, সে যে সমস্ত কথা বলেছে, সেগুলোর সত্যতা সম্পর্কেও নিজস্ব আঙ্গিকে তদন্ত হবে, যাতে স্পষ্ট হয় যে, সে সত্য বলছে কি, মিথ্যা? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কুরআনী শিক্ষা হল, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, ইন জাআকুম ফাসিকুন বিনাবাইন ফাতাবাইয়ানু (সূরা আল্-হুজুরাত: ০৭) অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যদি কোন ফাসেক বা বিশৃঙ্খলায় আসক্ত ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে আসে আর কারো সম্পর্কে কোন খারাপ কথা বলে, তাহলে বার্তাবাহক সম্পর্কে প্রথমে তদন্ত কর আর এরপর কোন ব্যবস্থা নাও। অথচ নিজের নাম প্রকাশ না করে অভিযোগকারী একদিকে নিজেই অপরাধ করে, তদুপরি এ কথা বলে যে, তার কথা যেন সেভাবেই গৃহীত হয়, যেভাবে সে লিখেছে আর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তাৎক্ষনিকভাবে যেন তার বিরুদ্ধে শাস্তির ফরমান জারি করা হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'ফাসেক' শব্দের অর্থ শুধু পাপাচারীই

নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবী ভাষায় পাপাচারীকেও 'ফাসেক' বলা হয়, কিন্তু আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকেও 'ফাসেক' বলে, যে রগচটা স্বভাবের, অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে যায়। 'ফিসক' শব্দের একটি অর্থ হল, ইতায়াত বা আনুগত্য না করা। আনুগত্যের গণ্ডি অতিক্রমকারী ব্যক্তিকেও 'ফাসেক' বলে। যে ব্যক্তি সহযোগিতা করে না, তাকেও 'ফাসেক' বলে। অর্থাৎ, যে ঝগড়াটে তো বটেই আবার সহযোগিতাও করে না। এছাড়া 'ফাসেক' শব্দ সেই ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি মানুষের তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরে। আর একই সাথে এটিও মনে করে এবং বলে যে, সে যা কিছু বলেছে, সে অনুসারে দ্বিতীয় পক্ষের চরম শাস্তি পাওয়া উচিত, ক্ষমা করার কোনই সুযোগ নেই। বদমেজাজি মানুষকেও 'ফাসেক' বলা হয়ে থাকে।

এক আহমদী বন্ধু সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, তিনি প্রবীণ নিষ্ঠাবান এক আহমদী ছিলেন আর তার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহও নেই। কিন্তু তুচ্ছ বিষয়েও বড় বড় ফতোয়া প্রদানে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। তিনি (রা.) বলেন, তার প্রকৃতিতে এ ব্যাধি ছিল যে, তুচ্ছ ও নগণ্য বিষয়েও তিনি কুফরের নিচে কোন কথাই বলতেন না। যেমন-তেমন কোন বিষয় দেখলেই তিনি 'কুফ্‌র'-এর ফতোয়া দিয়ে বসতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি বলেন, মানুষ যখন তাশাহ্‌হুদ বা আত্তাহ্যিয়াত-এ বসে, তখন ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো সোজা রাখতে হয় (পা সোজা রাখার নির্দেশ রয়েছে।)- এ বিষয়টিকেই ধরুন। তার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি এমন করে না, সে কুফরীর মত অপরাধ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার পায়ের আঙুলে ব্যথা ছিল (তাঁর গেঁটেবাত ছিল)-এ জন্য আমি তাশাহ্‌হুদ এ বসা অবস্থায় ডান পা সোজা করে বসতে পারতাম না। কিন্তু ইতিপূর্বে পা যখন সুস্থ্যাবস্থায় ছিল, তখন রাখতাম। তিনি (রা.) বলেন, হাফেয সাহেব (তিনি হাফেয ছিলেন) যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধেও কুফরী ফতোয়া জারি করে বসতেন। অতএব, এমন মানুষও রয়েছে। ফতোয়া জারি করার কারণ হল, এই ব্যক্তি পায়ের আঙ্গুল সোজা রাখে না আর এমনটি করা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত পরিপন্থি কাজ। অতএব, বুঝা গেল যে, রসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নতের প্রতি তার ঈমান নেই। এখন মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের প্রতি যদি ঈমান না থাকে, তাহলে কুরআনের প্রতিও ঈমান নেই। আর কুরআনের প্রতি যদি ঈমান না থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র প্রতিও ঈমান নেই। অতএব, সে কাফের হয়ে গেছে। যাহোক, নিষ্ঠাবান হলেও ত্বরা পরায়ণ এমন মানুষের জন্য হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নিজের নামও গোপন করে আবার ঈমানের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা প্রদর্শন করে আর অন্যদের বিরুদ্ধে ফতোয়াও প্রদান করে, এমন মানুষ তো 'ফাসেক' শব্দের যত অর্থ বর্ণিত হয়েছে, এর সবগুলো অর্থের নিরিখেই ফাসেক বলে গন্য হয়।

অতএব, অভিযোগ করার সময় যারা নিজের নাম লিখে না, এমন সব অভিযোগকারীর নিকট এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, নিজেদের পরিচয় গোপন করে অভিযোগ করার এ কাজটি কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থি। কেননা, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, প্রথমে অভিযোগকারী সম্পর্কে তদন্ত কর। কোন প্রকার তদন্ত ছাড়াই শুধু অভিযোগকারীর কথার উপর ভিত্তি করেই যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়ে যায়, তাহলে জামা'ত উন্নতির পরিবর্তে ক্রমশঃ অবনতির দিকে ধাবিত হতে শুরু করবে। অবনতির শিকার হবে। যুগ খলীফা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা, এতদুভয়ের

যে সমস্ত অভিযোগকারী নিজেদের নাম লেখে না আর লিখলেও ছদ্মনাম লিখে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল, এরা হয় মুনাফিক বা কপট নয়তো মিথ্যাবাদী। তাদের মাঝে সৎসাহস ও সততা থাকলে তাদের কোন কিছুরই তোয়াক্কা করার কথা নয়। তারা তো এ অঙ্গীকার করে যে, নিজ প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং সম্মান উৎসর্গ করার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত থাকব। কিন্তু তাদের ধারনা অনুসারে যখন জামা'তের সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন আসে, তখন তারা নিজের নাম গোপন করা আরম্ভ করে, যেন কোথাও তাদের সম্মান ও মর্যাদার হানি না ঘটে। অত এব, যে ব্যক্তি সূচনাতেই দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে, তার বাকি মতামতও ভ্রান্ত প্রমানিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

পক্ষ থেকেই কোন ধরণের তদন্ত হবে না। যে যা-ই বলবে, সে কথার উপর ভিত্তি করেই ব্যবস্থা নেয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। আর এ বিষয়টি কখনোই জামা'তের জন্য উন্নতির কারণ হতে পারে না। এমন হলে যে কেউ দাঁড়িয়ে বলবে, আমার ইচ্ছা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমারা যদি জানিও যে, অভিযোগকারী ব্যক্তি খুবই সতর্ক, পূণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান আর এমন ব্যক্তিও যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তথাপি সব কিছু জানা থাকা সত্ত্বেও অবশ্যই তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হবে এবং তদন্ত হবে। যেমনটি আমি বলেছি, অভিযোগকারী সম্পর্কে যদি এ নিশ্চিয়তাও থাকে যে, সে পুণ্যবান, সৎ, ভুল করে না এবং নিষ্ঠাবানও, তবুও সেই বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করা হবে এবং তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হবে। কেননা, কোন ব্যক্তি এ কথা বলার অধিকার রাখে না যে, যেহেতু আমি এটি বলছি, তাই এমনই বুঝতে হবে আর সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তিনি বলেন, রসূলে করীম (সা.) একবার নামায পড়াচ্ছিলেন। নামাযে তিলাওয়াত করার সময় কোন ভুল হয়ে গেলে হযরত আলী (রা.) লোকমা দেন। কেননা, তিনি মুক্তাদিদের মাঝে ছিলেন। কিন্তু রসূলে করীম (সা.) তা পছন্দ করেন নি। তিনি (সা.) তাকে (রা.) বলেন, কে তোমাকে লোকমা দিতে বলেছে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই অপছন্দের একটি কারণ এটিও হতে পারে যে, তোমার জন্য আরো অনেক বড় কাজ নির্ধারিত আছে, এ সব ছোট খাটো কাজ অন্যদের জন্য থাকতে দাও। আর এটিও একটি অর্থ হতে পারে যে, এ কাজ সে সব ক্বারীর, যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে কুরআন শিখতেন, তুমি এ কাজ তাদের জন্যই থাকতে দাও।

তাঁর কাছে বেনামী এই অভিযোগকরী সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই অভিযোগকারী কোন সম্মানিত মানুষ হলে আমি তাকে বলতে পারি যে, তুমি এ সব কাজ অন্য কারো জন্য ছেড়ে দাও আর নিজের আসল কাজের প্রতি মনোযোগী হও। কিন্তু পত্র লেখক যেহেতু নিজের নামই প্রকাশ করে নি, তাই তার মর্যাদা এবং অবস্থান সম্পর্কে জানা সম্ভব নয় আর তাকে বোঝানোও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, অভিযোগকারী বহু পদধারী কর্মকর্তা, নাযের এবং মহিলাদের উপরও অপবাদ আরোপ করা আরম্ভ করেছিল, খুবই বাজে সব অপবাদ আরোপ করেছিল আর বলেছিল, অমুক অমুক ব্যক্তির ভেতরে এই এই দোষ-ত্রুটি রয়েছে। এক দিকে, সে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছে যে, তারা পবিত্র কুরআন এবং রসূলে করীম (সা.)-এর শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করে, রসূল করীম (সা.) ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করাই যেহেতু অনেক বড় একটি দোষ, তাই তাদের মাঝে অনেক বড় বড় দোষ-ত্রুটি বিরাজমান। কোন মুসলমান যদি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার পরিপন্থি কোন কাজ না করে, তবে তা কোন দোষ বা অপরাধ নয়। কিন্তু সে যদি এ সব শিক্ষার পরিপন্থি কোন কাজ করে, তবে তা অপরাধ বা দোষ। যাহোক, এই অভিযোগকারী একদিকে বলছে, এরা মহানবী (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করছে, আর অপরদিকে সে নিজেই মহানবী (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষার বিরোধী কাজ করছে। কেননা, সে এই অভিযোগ এবং এর প্রমাণের সপক্ষে যে সব শর্ত আরোপ করেছে, সে নিজেই সেগুলোর লঙ্ঘন করছে আর অধিকাংশ মানুষই এমনটি করে। আমাকে যারা লিখে, তারা নিজেরাও এ শর্তগুলো ভঙ্গ করে থাকে। আসল বিষয় হল, কুরআনের শিক্ষা এবং সুন্নতের অনুসরণ করা। পবিত্র কুরআন তো বলে, কোন রাখ-ঢাক না করে যখন কথা বলা হয়, তখন এর সপক্ষে প্রমাণও উপস্থাপন করতে হবে এবং তদন্তও করতে হবে। কিন্তু নামই যেখানে প্রকাশ করা হচ্ছে না, সেখানে তদন্ত কিভাবে করা যেতে পারে? আর এটি তো কুরআনী শিক্ষার সুস্পষ্ট পরিপন্থি বিষয়। কাজেই, এমন অভিযোগকারী নিজেই কুরআনী শিক্ষা লঙ্ঘন করে। পবিত্র কুরআন এবং রসূলে করীম (সা.)-এর শিক্ষার অনুসরণ করাই হল, নেকী এবং পুণ্য, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। কোন ব্যক্তির নিজস্ব অভিরুচি বা সামাজিক প্রভাবের অধীনে কোন বিষয় যদি অপছন্দনীয় মনে হয় আর পবিত্র কুরআন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে তা যদি সঠিক হয়, তবে তা সঠিক আর এতে দোষ-ত্রুটির কিছু নেই।

কিছু কিছু মানুষ, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কোন কোন বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের কথা ধর্মের নামে হলেও এগুলোর কোন মূল্য নেই। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এ ঘটনাটি ইতিপূর্বেও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে এখন এটি পুনরায় উপস্থাপিত হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে সাথে নিয়ে রেল স্টেশনে পায়চারি করছিলেন। সে দিনগুলোতে পর্দার বিষয়ে খুব কঠোরতা করা হতো। (সে যুগে পর্দা খুব কঠোরভাবে পালন করা হতো।) মহিলারা পালকিতে করে স্টেশনে আসত। (সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা পালকিতে করে স্টেশনে আসত আর সেই পালকির ডানে-বামে চাদর দিয়ে পর্দা করা হতো এবং ট্রেনের বগি পর্যন্ত এমন আবদ্ধ অবস্থায়ই আসত আর সেই একই অবস্থায় বগিতে উঠিয়ে দেয়া হতো। তখন পর্দার এমন ব্যবস্থাই ছিল।) আর বগিতে উঠে আসন গ্রহণ করার পর জানালা বন্ধ করে দেয়া হতো (কেউ যেন মহিলাদের দেখতে না পায়)। তিনি (রা.) বলেন, এরূপ পর্দা যাতনার কারণ এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি ছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করতেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন বোরকা পরিধান করতেন এবং ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। সেদিনও হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) বোরকা পরিহিতা ছিলেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে

সাথে নিয়ে প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলেন। [মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও সাথে ছিলেন।] মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের স্বভাবে তড়িঘড়ি কিছু করে ফেলার অভ্যাস ছিল। তিনি ভাবলেন, এটি ঠিক হচ্ছে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সরাসরি কিছু বলার মত সাহসও তার ছিল না, তাই তিনি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে যান এবং বলেন, এ কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড হচ্ছে? আগামীকালের পত্র-পত্রিকায় তো হৈচৈ পড়ে যাবে আর বিজ্ঞাপন ও নিবন্ধ প্রকাশিত হবে যে, মির্যা সাহেব তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলেন। অতএব, আপনি গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে একটু বুঝান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, এতে দোষের কী আছে? আমার কাছে তো খারাপ কিছু মনে হচ্ছে না। আপনার দৃষ্টিতে যদি খারাপ মনে হয়, তাহলে আপনি নিজেই গিয়ে বলুন। যাহোক, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যান। তিনি পায়চারি করতে করতে অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মাথা নিচু করে ফিরে আসেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, কী উত্তর তিনি পেলেন, তা জানার জন্য আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মৌলভী সাহেব! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কী বলেছেন?' মৌলভী সাহেব বললেন, আমি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বললাম, এটি আপনি কী করছেন, মানুষ কী বলবে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তরে বললেন, কী আর বলবে? সর্বোচ্চ এটিই বলবে যে, মির্যা সাহেব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পায়চারি করছিলেন। মৌলভী সাহেব লজ্জিত হয়ে ফিরে আসেন। হযতর উম্মুল মু'মিনীন পর্দা করে রেখেছিলেন আর স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে পায়চারি করা আপত্তির কোন বিষয়ও নয়। মহানবী (সা.) নিজেও তাঁর স্ত্রীদের সাথে নিয়ে এভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর একবার তিনি (সা.) জনসমক্ষেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। প্রথমবার রসূলে করীম (সা.) পিছিয়ে থাকেন এবং হযরত আয়েশা (রা.) জিতে যান। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয়বার আবার দৌড় প্রতিযোগিতা হয় আর রসূলে করীম (সা.) বিজয়ী হন এবং হযরত আয়েশা (রা.) পরাজিত হন। এরপর রসূলে করীম (সা.) বলেন, হে আয়শা! 'তিলকা বে তিলকা' অর্থাৎ, হে আয়েশা! এটি হল তোমার সেই বিজয়ের পাল্টা পরাজয়। মোটকথা, রসূলে করীম (সা.) নিজের স্ত্রীদের সাথে ঘুরে বেড়ানোকে অপছন্দনীয় মনে করতেন না আর ইসলাম যে কাজের অনুমতি দিয়েছে, সেটিকে দোষের কিছু বলা যাবে না। অতএব, কোন ব্যক্তির অন্য কারো উপর আপত্তি করার অর্থ, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করে না।

অভিযোগকারী সম্পর্কে তিনি (রা.) পুনরায় বলেন, কিন্তু সে তার পত্রে লিখেছে, অমুক ব্যক্তি নিম্ন শ্রেণির মানুষ। (এখানে ব্যক্তিগত ও বংশগত আপত্তিও শুরু হয়ে গেছে।) অমুক ব্যক্তি নীচু শ্রেণির মানুষ তথাপি আপনি তাকে অমুক পদ দিয়ে রেখেছেন। এছাড়া এমন আরো কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছে, যেগুলো সম্পর্কে শরীয়ত সাক্ষী দাবি করে আর তাও আবার চাক্ষুস সাক্ষী হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, এ প্রসঙ্গে শরীয়তের শিক্ষা হল, চার ব্যক্তি যদি চাক্ষুস সাক্ষী থাকে, তাহলেই তা যথাযথ অভিযোগ হিসেবে গণ্য হবে, অন্যথায় নয়। অনেকে এমনিতেই কোন ছেলে ও মেয়ের মাঝে অবৈধ সম্পর্কের অপবাদ আরোপ করে থাকে। অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ আনতে হলে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে চারজন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। তিনি (রা.) বলেন, বিস্ময়ের বিষয় হল, ধর্মীয় আত্মাভিমান এমন এক ব্যক্তির হৃদয়ে দানা বেঁধেছে, যে নিজেই ইসলামী শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করেছে আর অন্যদের উপর এমন সব অপবাদ আরোপ করেছে, যা আরোপ করতে পবিত্র কুরআন নিষেধ করেছে আর শুধু নিষেধই করে নি বরং এমন অপবাদের জন্য শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে। কারো প্রতি অন্যায়ভাবে অপবাদ আরোপকারীকে, অর্থাৎ- যারা এমন কথা বলে, তাদেরকে ৮০বার চাবুক মার। যে বিষয়ে শরীয়ত এত কঠোর নির্দেশ দিয়েছে, সে তো সেটির লঙ্ঘন করেছেই, আবার বলে, অমুক ব্যক্তি কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করেছে। অথচ সে নিজেই কুরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে।

তিনি (রা.) বলেন, দেখ! অভিযোগকারীদের অবস্থান কী হয়েছে? প্রথমত সে তার নাম প্রকাশ করে নি এবং এরপর প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিও উপস্থাপন করে নি। আমি নিজেও শরীয়তের বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে নই আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও নন। স্বয়ং রসূলে করীম (সা.) শরীয়তের শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করতে বাধ্য ছিলেন। অতএব, সেই ব্যক্তি এমন কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছে, যার জন্য শরীয়ত শাস্তি প্রস্তাব করে সীমা নির্ধারিত করে রেখেছে। আর সাক্ষ্য উপস্থাপনের যে পদ্ধতি শরীয়ত শিখিয়েছে, তা অনুসরণ করা আবশ্যক। কিন্তু সে বলে, অমুক ব্যক্তি অমুক কুরআনী শিক্ষা লঙ্ঘন করেছে। কাজেই, তাকে শাস্তি দাও আর আমাকে কিছুই বলো না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, শৈশবের একটি কৌতুকপূর্ণ ঘটনা আমার মনে পড়ছে। তখন আমি এটিকে খুব উপভোগ করেছিলাম আর মনে পড়লে আজও আমার হাসি পায়। তিনি (রা.) বলেন, তখন আমি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তাম। আমাদের শিক্ষক এ রীতি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, তার প্রশ্নের উত্তর যে ছাত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দিতে সক্ষম হবে, তার রোল নম্বর এগিয়ে আসবে। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। শিক্ষক প্রশ্ন করেন আর এক ছাত্র এর উত্তর দেয়। দ্বিতীয় ছাত্র হাত উঠিয়ে বলে, শিক্ষক মহাশয়! এ উত্তর ভুল। শিক্ষক প্রথম ছাত্রকে বলেন, তুমি নিচে নেমে যাও আর দ্বিতীয় ছাত্রকে বলেন, তুমি উপরে চলে আস। নিচে যেতেই সেই ছাত্র, যে পূর্বে উপরের নম্বরে ছিল সে বলে, শিক্ষক মহাশয়! সে আমার ভুল ধরতে গিয়ে 'গালাত' শব্দের উচ্চারণ করতে গিয়ে 'গাল্‌ত্' বলেছে, যা একটি ভুল উচ্চারণ। শিক্ষক পুনরায় তাকে পূর্বের জায়গায় বহাল করে দেন এবং

দ্বিতীয় ছাত্রকে আবার নিচে নামিয়ে দেন। তাই তিনি (রা.) বলেন, কতক আপত্তিকারীর অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। তারা অন্যদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত বা সঠিক আপত্তি করে থাকে, কিন্তু তাদের আপত্তি করার রীতিটি অন্যায় হয়ে থাকে। আর এভাবে তাকে শাস্তির মুখোমুখি করতে গিয়ে নিজেরাই শাস্তিযোগ্য হয়ে যায়। আর এরপর তারা হৈ চৈ শুরু করে যে, অপরাধীকে কেউ কিছু বলে না, বরং যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই শাস্তি দেয়া হয়। শাস্তিদাতারা করলেও কী করবেন, তারাও তো শরীয়তেরই গোলাম। তোমরা যদি কুরআনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তবে নিজের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার অনুশাসনকে শিরোধার্য কর। তোমরা যদি চাও, অন্যদের উপর খোদার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক আর তোমাদের উপর তা প্রতিষ্ঠিত না হোক, তাহলে এটি সঙ্গত কথা নয়। তাই, অভিযোগকারীদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, 'আইয়্যায কাদরে খুদ বেশানাস' অর্থাৎ, হে আইয়্যায! তোমার নিজের অবস্থান এবং মর্যাদার কথা প্রথমে স্মরণ রাখ এবং অনুধাবণ কর। ছদ্মবেশী ব্যক্তিরা নিজেদের নাম গোপন রেখে অন্যদের উপর অপবাদ আরোপ করে যে, এদের কোন মর্যাদাই নেই আর অপবাদের সপক্ষে যেসব প্রমাণ উপস্থান করে তা হল, অমুক ব্যক্তি অমুক বংশের লোক, তাই তার কোন অবস্থান নেই এবং সে এমন। অথচ এমন অপবাদের কোন গুরুত্ব থাকে না আর যারা অপবাদ আরোপ করে, তারা নিজেরাও আসলে গুরুত্বহীন মানুষই হয়ে থাকে। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারেই আমাদেরকে চলতে হবে, যিনি আমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক আর সবারই প্রভু-প্রতিপালক। তিনি সবার জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করেন এবং লালন-পালন করেন। অতএব, সব কিছুই যখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে নিচ্ছি, তখন অপবাদ আরোপকারীর কথা নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার কথাই আমাদের মানতে হবে। আমি যেমনটি বলেছি, অভিযোগকারীরা এটাই চায় যে, অন্যদেরকে যেন শরীয়ত অনুসারে শাস্তি দেয়া হয় আর নিজেদেরকে তারা শরীয়তের নির্দেশের বাহিরে রাখে, নিজেদেরকে শরীয়তের শিক্ষার উর্ধ্বে জ্ঞান করে। নিজেরাই নিজেদের বিচারক সাজে। অতএব, এমন সব মানুষের বিষয় যখন সামনে আসবে এবং স্পষ্ট হবে, তখন তারাও শরীয়তের শিক্ষা অনুসারেই শাস্তি পাবে।

এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যে ক্ষেত্রে সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। সাক্ষী যদি সামনে না আসে, তবে সেই কথার কোন গুরুত্বই থাকে না। আর শরীয়ত ও কুরআনী শিক্ষা অনুসারেই এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হবে।

অনেক সময় বলা হয় যে, সে মিথ্যা কসম খেয়ে শাস্তি এড়াতে সক্ষম হয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে একবার এমন একটি বিষয় উপস্থাপিত হয়। বিবাদে লিপ্ত দুই পক্ষ রসূলে করীম (সা.)-এর নিকট এলে তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে এক পক্ষ কসম খাবে। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, সে মিথ্যাবাদী, সে তো একশত বারও কসম খেতে পারবে। তিনি (সা.) বলেন, আমি খোদার নির্দেশ অনুসারে সিদ্ধান্ত নিব। সে যদি মিথ্যা কসম খায়, তাহলে তার বিষয়টি খোদার হাতে, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাকে শাস্তি দিবেন। (খুতবাতে মাহমুদ, ৩৩তম খণ্ড, পৃ. ২৬৫-২৭১, খুতবার তারিখ, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫২)

অতএব, সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কারো অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুধু তার প্রস্তাব অনুসারেই সিদ্ধান্ত হবে না, বরং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে খোদা তা'লার নির্ধারিত নীতি অনুসারে। যে ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে দুইজন সাক্ষীকেই উপস্থিত করতে হবে আর যে ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে চারজন সাক্ষীই উপস্থিত করতে হবে। আর সেই অনুসারেই তদন্ত হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আমরা যদি খোদার নির্দেশ অনুসারে আমাদের বিষয়াদির নিষ্পত্তি করি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তবে এতেই আমাদের সাফল্য নিহিত। নিজেদের আমিত্ব এবং পছন্দ-অপছন্দকে ভিত্তি বানিয়ে জামা'তী নেযাম এবং যুগ খলীফাকে আমরা যেন এভাবে বাধ্য করার চেষ্টা না করি যে, এ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়া হোক। আল্লাহ্ তা'লা অভিযোগকারীদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিন। সঠিক মনে করলে তারা যেন সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণসহ অভিযোগ করে, যাতে তাদের নাম-ঠিকানা থাকবে এবং তারা নিজেরাও তদন্তে অন্তর্ভুক্ত হবে। মানুষ যখন জামা'তের ব্যবস্থাপনার মাঝে কোন ব্যত্যয় ঘটতে দেখবে, তখন অবশ্যই তার উচিত, বীরত্বের সাথে সামনে আসা, অভিযোগ করা এবং সব কিছুর মোকাবিলা করা। একইভাবে জামা'তের ব্যবস্থাপনাকেও আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক ও বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। অর্থাৎ, যুগ খলীফার পক্ষ থেকে যাদের হাতে সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তারাও যখন সিদ্ধান্ত দিবেন, তখন যেন ইনসাফ বা ন্যায়-নীতির প্রতিটি দিক সামনে রাখেন এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ ও সুন্নতের অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নামাযের পর আমি গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথম জানাযাটি হবে এক শহীদের। তিনি জনাব শেখ মজিদ আহমদ সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় শেখ সাজেদ মাহমুদ সাহেব। মরহুমের বয়স ছিল ৫৫ বছর। তিনি করাচী জেলার গুলজার হিজরী হালকায় বসবাস করতেন। বিরোধীরা গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ সনে মাগরিবের নামাযের পর বাড়ির বাহিরে গাড়িতে বসা অবস্থায় গুলি করে তাকে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে শেখ সাজেদ মাহমুদ সাহেব করাচীর শালিমার-এ ময়দার কারখানায় স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের কাজ করতেন। ২০১৬ সনের ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাযের পর বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী কিনে তিনি বাড়ি আসেন। তখনও তিনি গাড়িতেই বসেছিলেন, যখন অজ্ঞাত পরিচয় মটর সাইকেল আরোহী এক ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে চারবার গুলি করে। এরপর যাওয়ার সময় আরো চারবার গুলি করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সেগুলোর একটি গুলি সাজিদ মাহমুদ সাহেবের বুকের ডান দিকে আঘাত করে এবং পাঁজর ফুঁড়ে বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। আরেকটি গুলি তার পায়ে লাগে।

সাজেদ মাহমুদ সাহেবকে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে আগাখান হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়, কিন্তু তার প্রাণ রক্ষা হয় নি। চিকিৎসা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন, ইন্না ল্লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাদের বংশে আহমদীয়াত আসে তার বড় দাদা জনাব শেখ ফজল করীম সাহেবের মাধ্যমে। ১৯২০ সনে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। শহীদ মরহুমের পিতা শেখ মজিদ আহমদ সাহেব পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের কানপুর থেকে হিজরত করে লাহোর চলে আসেন। পরবর্তীতে ১৯৬১ সনে তিনি করাচীতে বসবাস করা শুরু করেন। শহীদ মরহুমের দাদা জনাব খাজা মোহাম্মদ শরীফ সাহেব দীর্ঘ দিন লাহোরের 'দেহ্‌লী দারওয়াজা' জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার বড় নানা হযরত সাহেব উদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। অনুরূপভাবে কোলকাতার মরহুম শেঠ মোহাম্মদ সিদ্দীক বাণী সাহেব শহীদ মরহুমের স্ত্রীর নানা ছিলেন। শহীদ মরহুম বি.এ. পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ভীষণ কষ্টের মাঝে পাঁচ বছর অতিবাহিত করার পর তিনি আটার মিলের স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের ব্যবসা আরম্ভ করেন, যাতে আল্লাহ্ তা'লা প্রভূত বরকত দান করেন, ফলে তার ব্যবসা অনেক ব্যাপকতা লাভ করে। শহীদ মরহুমের পুত্র হারেস মাহমুদ সাহেব, নায়েব কায়েদ আর একই সাথে করাচীর গুলশান ইকবাল-এর সেক্রেটারী ওসীয়্যতও। তার পুত্র পড়াশোনা শেষে 'এ.সি.সি.এ.' করার পর পিতার সাথেই তার ব্যবসায় যোগ দেন। শহীদ মরহুম বহু গুণাবলীর আধার ছিলেন। অনুরূপভাবে, শহীদের কন্যা সানা মুবাশ্বেরা সাহেবা করাচীতে অধ্যয়ন রত আছেন। ৬ মাসের বৃত্তি নিয়ে তিনি আমেরিকা যাওয়ার সুযোগও লাভ করেছেন এবং সেখান থেকে একটি শর্ট কোর্স করে এসেছেন। খিলাফতের প্রতি মরহুমের সুগভীর ভালোবাসা এবং গভীর সম্পর্ক ছিল। সন্তান-সন্ততিকে তিনি সর্বদা খিলাফত এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহত করতেন। তিনি নিজেও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে চাঁদা দিতেন আর ছেলেকেও এ বিষয়ে নসীহত করতেন। চাঁদা প্রদানের বিষয়ে তিনি সব সময় সোচ্চার থাকতেন। চাঁদার জন্য দোকানে একটি পৃথক ব্যাংক রেখেছিলেন, যাতে তিনি চাঁদার টাকা জমা করতেন। লেনদেনের ক্ষেত্রে খুবই বিশ্বস্ত ও দিয়ানতদার ছিলেন। সর্বদা তিনি সত্যকে অগ্রগণ্য রাখতেন এবং মার্জনা করতেন। ভাই-বোনদের সাথে সব সময় নম্র আচরণ করেছেন আর কখনোই কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন না। মরহুম পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী স্বচ্ছ একজন মানুষ ছিলেন। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শহীদ মরহুম তার দুটি দোকানের নাম করণ করেছিলেন মরহুম পিতা ও শ্বশুরের নামে। স্ত্রীর আত্মীয়দের সাথে তিনি অনুকরণীয় উত্তম ব্যবহার করতেন। বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে স্বচ্ছ হৃদয়ে সাক্ষাৎ করতেন। তার হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষের লেশমাত্রও ছিল না। বিভিন্ন মানুষ যা কিছু লিখেছে, সে সব কথার সারাংশ তা-ই, যা আমি শহীদের গুণাবলী হিসেবে তুলে ধরেছি। শহীদ মরহুমের মাতা আজকাল খুবই অসুস্থ, তার অসুস্থতার কারণে ছেলের শাহাদাত সম্পর্কে তাকে জানানো কঠিন ছিল। কিন্তু তিনি যখন তা জানতে পারেন এবং ছেলের মৃতদেহ দেখেন, তখন তিনি অবলীলায় বলে উঠেন, 'আমার ছেলে শহীদ, কেউ কাঁদবে না।' আর এই কথাটি তিনি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেন। শহীদ মরহুমের শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে স্বামীর শাহাদাতের সংবাদ শুনেন এবং সুমহান ধৈর্য্য প্রদর্শন করেন। তার পুত্র বলেন, আমার পিতা খুবই ধীর-স্থীর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্‌র প্রতি তিনি অটল-বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বারবার বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছেন আর এত সম্মান দিয়েছেন যে, আমি নিজেও তা ভাবতে পারি না। ইবাদতে খুবই নিয়মানুবর্তী ছিলেন। মরহুমের আত্মীয়-স্বজনরাও বলেন, তিনি খুবই সরল প্রকৃতির, সহানুভুতিশীল এবং বিনয়ী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মরহুমের ১১ জন ভাই-বোন আর তাদের সবারই স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। শহীদ মরহুম তাদের সবার সাথে উত্তম আচরণ করতেন এবং দেখাশুনা করতেন। 'সাক্কুর' (ঝঁশশঁৎ) জেলায় যখন জামা'তী অবস্থার অবনতি ঘটে এবং শাহাদাতের ঘটনা ঘটে, তখন শহীদ মরহুম সেখানে গিয়ে বেশ কিছুদিন এক নাগাড়ে ডিউটি করেছেন। তার মেয়ে বলেন, তার মৃত্যুর পর আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, অনেক বড় একটি বাগানে জ্যোতির্ময় চেহারার বহু মানুষ একত্রে অবস্থান করছে। তাদের সবাই উজ্জ্বল শুভ্র পোশাক পরিহিত এবং আব্বুও সেখানে আছেন। তার মর্যাদা অনেক উঁচু। সবাই আব্বুকে ঘিরে ধরে আনন্দ প্রকাশ করছে। পরে আমার বাবা একদিকে যাত্রা করেন আর সবাই দলবদ্ধভাবে তার সাথে চলতে থাকে। আর সবাই তার পিতাকে দেখে আনন্দিত হচ্ছিল। যেভাবে আমি বলেছি, শহীদ মরহুমের শ্রদ্ধেয়া মা দৈহিকভাবে খুবই দুর্বল, চলাফেরা করতে পারেন না। শাহাদাতের পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, শহীদ মরহুম তার মাকে সম্বোধন করে বলছেন, আমি এখানে খুবই আনন্দিত এবং শান্তিতে আছি, আমার জন্য আপনি মোটেও দুশ্চিন্তা করবেন না। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারে শ্রদ্ধেয়া মা, স্ত্রী মনসুরা ইয়াসমিন, ছেলে শেখ হারেস মাহমুদ, কন্যা সানা মুবাশ্বেরা সাহেবা ছাড়াও চার ভাই এবং ছয় বোন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী জানাযা শ্রদ্ধেয় শেখ আব্দুল কাদির সাহেবের। তার পিতার নাম শেখ আব্দুল করীম সাহেব। তিনি কাদিয়ানের দরবেশ ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৬ নভেম্বর তারিখে ৯২ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না ল্লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বংশে আহমদীয়াত আসে হযরত আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব-এর মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। ১৯৪৭ সনে নভেম্বর মাসে যখন কাদিয়ান থেকে শেষ কাফেলা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তখন তিনি তার অসুস্থ মায়ের ঠ্যাকনা

অতএব, সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কারো অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুধু তার প্রস্তাব অনুসারেই সিদ্ধান্ত হবে না, বরং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে খোদা তা'লার নির্ধারিত নীতি অনুসারে। যে ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে দুইজন সাক্ষীকেই উপস্থিত করতে হবে আর যে ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে চারজন সাক্ষীই উপস্থিত করতে হবে। আর সেই অনুসারেই তদন্ত হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আমরা যদি খোদার নির্দেশ অনুসারে আমাদের বিষয়াদির নিষ্পত্তি করি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তবে এতেই আমাদের সাফল্য নিহিত। নিজেদের আমিত্ব এবং পছন্দ-অপছন্দকে ভিত্তি বানিয়ে জামা'তী নেযাম এবং যুগ খলীফাকে আমরা যেন এভাবে বাধ্য করার চেষ্টা না করি যে, এ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়া হোক।

হয়ে ট্রাকে বসে ছিলেন, কাদিয়ানের সীমান্তের কাছে এসে তার মা তাকে কেন্দ্রের হেফাজতের জন্য ট্রাক থামিয়ে নামিয়ে দেন আর এভাবে তিনি দরবেশীর সৌভাগ্য লাভ করেন। খিলাফত ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল। আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বসা ছিল এবং প্রতিটি সাফল্য ও ব্যর্থতাকে খোদার সন্তুষ্টি মনে করে হাসি মুখে বরণ করতেন। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সব সময় ভাল ব্যবহার করতেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজ হাতে কাজ করেছেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের বিভিন্ন অফিসের বিভিন্ন বিভাগে তিনি দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পেয়েছেন। তার ছেলে লিখেন, আসন্ন জলসা সালানার উদ্দেশ্যে বাসার হোয়াইট ওয়াশের জন্য সিমেন্ট ইত্যাদি আনিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই রাতেই তিনি ডেকে বলেন, মনে হয় আমার শেষ সময় সন্নিকটে, অমুক ব্যক্তি থেকে পাঁচশত রুপিয়া নিয়েছিলাম, তা পরিশোধ করতে হবে আর একইভাবে অন্যান্য হিসাব-কিতাবের কথা অবহিত করে তিনি স্বল্পক্ষণের মাঝেই ইহধাম ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার রেখে যাওয়া পরিবার-পরিজনের মাঝে তিন মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। মরহুমের ছেলে জনাব নাসের ওয়াহিদ সাহেব কাদিয়ানে জামা'তের সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন।

তৃতীয় জানাযা তানভীর আহমদ লোন সাহেবের, যিনি কাশ্মীরের নাসেরাবাদের অধিবাসী। তিনি পুলিশ বিভাগে ছিলেন। গত ২৫ নভেম্বর দায়িত্বরত অবস্থায় জেলা সদরের কোলগামে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীদের গুলিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইনিও শহীদের মর্যাদা রাখেন। শহীদ মরহুম নামায-রোযায় খুবই অভ্যস্ত, নেক হৃদয়ের অধিকারী, গরীবদের লালন-পালনকারী, মিশুক, চরিত্রবান, বিশ্বস্ত, মানুষের কল্যাণকামী, ভীষণ বীরত্বের অধিকারী এবং আল্লাহ্‌র উপর আস্থাশীল ব্যক্তি ছিলেন।

আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন, হার অনুসারে এবং বর্ধিতহারে নিয়মিত চাঁদা দিতেন। তিনি তার ছোট ভাই-বোনদের মনস্তুষ্টি করতেন, তাদের সাহায্য করতেন, তাদের পড়াশোনার ব্যাপারে সব সময় সচেতন থাকতেন। প্রতিবেশীদের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি সত্যিকার অর্থে প্রতিবেশীর প্রাপ্য প্রদানকারী ছিলেন। তার সহকর্মীদের বিবৃতি হল, তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তিনি সব সময় সচেতন ও সোচ্চার থাকতেন। কখনোই তিনি আলস্য ও ঔদাসিন্য প্রদর্শন করতেন না।

মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারে মা ছাড়াও ২ বোন, ৬ ভাই, স্ত্রী এবং ৩ জন নিষ্পাপ শিশু রেখে গেছেন। তার এক পুত্র তাহরীকে ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকে সব সময় জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন আর তিনি নিজেই তাদের তত্ত্বাবধানকারী হোন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬)

(কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(১১তম কিস্তি)

বস্তুবাদী সমাজের চারটি বৈশিষ্ট্য

"তোমাদেরকে কিসে সাকারে (জাহান্নামে) প্রবিষ্ট করলো? তারা বলবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্গত ছিলাম না এবং আমরা মিসকিনীদেরকে আহার্য দান করতাম না এবং বাজে গল্পকারীদের সঙ্গে মিলে আমরা বাজে গল্প করে বেড়াতাম এবং বিচার দিবসকে আমরা মিথ্যা আখ্যা দিয়ে অস্বীকার করতাম।" (আল মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ঃ ৪৩-৪৭)

এর চাইতে সংক্ষেপ অথচ সম্পূর্ণরূপে নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে পেশ করা সম্ভব নয়। এই বৈশিষ্টগুলো হচ্ছেঃ

(১) এবাদত করতে ব্যর্থ হওয়া,

(২) দরিদ্রকে আহার্য-দানে ব্যর্থ হওয়া,

(৩) বাজে কাজে ও বৃথা-কাজে ব্যাপৃত থাকা,

(৪) বিচার দিবসকে বা জবাবদিহিতাকে অস্বীকার করা।

বাকী আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে, আমাদের একটা বিভ্রান্তির অপনোদন করা উচিত, নইলে যেকোন সমাজের অবস্থার সঠিক রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়বে। কেননা যে সকল সমাজে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস বেশ লক্ষ্যণীয়ভাবে শক্ত বলেই মনে হয় এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসও যাদের ধর্মের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে স্বীকৃত, সেখানেও খোদা বিশ্বাসী এবং পরকালের হিসাব নিকাশে বিশ্বাসী লোকদের মধ্যে যে অনুরূপ অশুভের ও খারাপীর বিস্তার দেখা যায়, তার তো কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যাদান করা মুশকিল।

এমন হলে, এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, এই সমাজগুলো, অন্যসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একদম পুরোপুরি বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও, খোদাতে এবং পরকালে কীভাবে বিশ্বাস করে? এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া কঠিন হবে না, যদি আমরা তাদের সেই বিশ্বাসের গভীরতা একবার পরখ করে দেখি। বস্তুতঃ, খোদার প্রতি মাত্র একটা দূরবর্তী থিওসফিক্যাল বিশ্বাস অন্য বিশ্বাসীদের সামাজিক আবরণের ওপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, ঐ জাতীয় বিশ্বাসগুলো কেবল তাত্ত্বিক মাত্র, এগুলো কখনোই ঐশী বা পবিত্র চরিত্র-গঠনে কার্যকর হয় না। খোদার প্রতি খাঁটি বিশ্বাস এবং মিথ্যা, মিথ্যাচারিতা, চরম স্বার্থপরতা, অন্যের অধিকার হরণ, দুর্নীতি ও নিপীড়ন কী করে এক সঙ্গে থাকতে পারে? ঐ সকল সমাজের খোদা সম্পর্কিত ধারণাটি হচ্ছে একটা সৌখিন প্রলেপ মাত্র যা একেবারেই অবাস্তব, এবং তার পক্ষে মানব চরিত্র গঠনে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখার কথাটা একটা হাওয়াই গল্প ছাড়া আর কি! অনুরূপভাবে, পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাস এবং জবাবদিহির বিষয়টাকেও একটা দূরবর্তী সম্ভাবনার আবছা ছায়ায় পর্যবসিত করা হয়েছে। বাছাই-বর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিটা মুহূর্তে ইহলৌকিক বা তাৎক্ষণিক স্বার্থটাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং পরকালের জীবনের বিবেচনাটাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যখন, আমরা বস্তুবাদী সমাজগুলোর কথা বলি, তখন আমরা কেবল সেই সব সমাজের কথাই বলি না, যেগুলো খোদার ধারণার বিরুদ্ধে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রায় সব আস্তিক্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী সমাজকে স্ব স্ব আদর্শের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলোর মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যই বিদ্যমান।

জবাবদিহিতা

পবিত্র কুরআন, পক্ষান্তরে, ঘোষণা করে, "যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু ভূমন্ডলে আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র। তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা তোমরা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব নিবেন; অতঃপর তিনি যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন, এবং যাকে চাইবেন শাস্তি দেবেন, এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের ওপরে সর্বশক্তিমান। (আল বাকারা, ২ঃ ২৮৫)।

পবিত্র কুরআন আরও বলে, "এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পশ্চাদানুসরণ করো না। নিশ্চয়, কান, চোখ এবং হৃদয়-এদের প্রত্যেকটি সে বিষয়ে জিজ্ঞাসত হবে।" (বনী ইসরাঈল, ৭ঃ ৩৭)

এখানে 'হৃদয়' বলতে কুরআন করীম বুঝিয়েছে চূড়ান্ত জীবন-শক্তিকে যা ক্রিয়াশীল রয়েছে প্রতিটি মানবীয় কর্মের পেছনে। পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত 'ফুয়াদ'-এর অর্থ হচ্ছে মানুষের সেই চূড়ান্ত ফয়সালাকারী ইচ্ছা যা মস্তিষ্কে পরিচালিত করে ঠিক সেইভাবে যেভাবে কেউ কম্পিউটার পরিচালনা করে। কাজেই, চূড়ান্ত ইচ্ছাই হচ্ছে সকল শুভ ও অশুভের উৎসস্থল, এবং এটাই সেই ইচ্ছা যাকে মৃত্যুর পরে একটা নতুন সকল শুভ ও অশুভের উৎসস্থল এবং এটাই সেই ইচ্ছা যাকে মৃত্যুর পরে একটা নতুন জীবন রূপে, চক্ষু ও কর্ণ সহকারে, জবাবদিহি হতে হবে।

এখন আসুন নিরীশ্বরবাদী সমাজগুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পরখ করে দেখি। রক্ষ্য করা যায় যে, নাস্তিকতা ও পরকালে অবিশ্বাস অর্ধ- সচেতন অবস্থায় অস্পষ্ট এবং অসনাক্ত থেকে যায়। ধর্মগুলির ক্ষেত্রে, বাহ্যতঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং পরকালে যে কেউ বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, তার কাছে সেগুলোর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কখনও কখনও কারো সচেতন মনে এই গুপ্ত সত্যকে স্থান দেওয়াটাই একটা সংকটের সৃষ্টি করে। আবার কখনও কখনও, প্রজন্মের পর প্রজন্ম অতীত হয়ে যায় তাদের এই বিশ্বাসের চপলতা ও ভঙ্গুরতা উপলব্ধি না করেই। যখন একটা যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে আর একটা নতুন যুগের সূচনা হয়, তখন গোটা সমাজটাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তার বিশ্বাসগুলোকে পরখ করে দেখতে চায়। এবং এটাই সেই ক্রান্তিকাল যখন নাস্তিকতা এবং পরকালে অবিশ্বাস যা এতদিন অগোচরে ছিল, অপ্রতিহত ছিল-তা গোচরীভূত হতে থাকে। একটা সমাজ, যা নির্বিচারে ও নির্বিবাদে সুখ ভোগের মধ্যে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের বিশ্বাসকে সজ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করে, সেখান নৈতিক অধঃপতন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দ্রুত প্রসার লাভ করে।

সভ্যতার গতি রুক্ষতা থেকে পরিমার্জনা বা মসৃণতার দিকে ধাবিত, তা সেই সভ্যতা মানবেতিহাসের যে কোন দেশের হোক, আর যে কোন কালের হোক। মানুষের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণাগুলো, যা মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে আন্তঃসলিলা চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে, তা অপরিবর্তনশীল থাকে। পরবর্তিত যা হয়, তা হচ্ছে সেই সব পরিবর্তনের প্রতি সাড়া বা প্রতিক্রিয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কেউ তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারে গোশ্‌ত খেয়ে বা শাক-সব্জী খেয়ে। সেই গোশ্‌তের বা শাক-সব্জীর মান বা সেগুলোর টাটকা-তাজা থাকাটার মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে। কেউ সেগুলো রান্না-বান্না করে খেতে পারে, কেউবা কাঁচা খাওয়াই পছন্দ করতে পারে।

একটা সমাজ যখন উন্নত হতে থাকে, তখন তার যাবতীয় মৌলিক প্রেরণার প্রক্রিয়াগুলোরও বিবর্তন ঘটতে থাকে এবং সেগুলো ক্রমাগতভাবে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে, যদিও এর পথ নিরূপিত হয় অধিকাংশ জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহের দ্বারা, কিন্তু সমাজের অগ্রযাত্রা অব্যাহতই থাকে, কখনও বা মন্থর, কখনও বা দ্রুত গতিতে।

যখন কোন সভ্যতা পরিপক্ক হয় বা পরিণতি লাভ করে, তখন অতি-মিশ্রণ বা অতি-জটিলতা এবং অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয়াদি প্রগতির ধারাকে উল্টোখাতে প্রবাহিত করে দেয়। ক্ষয়িষ্ণু সমাজগুলোতে তখন (সভ্যতার) গতি বিপরীতমুখী হয়ে মসৃণতা বা পরিমার্জনা থেকে রুক্ষতার দিকে ধাবিত হয়। এটি একটি ব্যাপক বিষয় এবং এর বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। আমি দুঃখিত যে, এটি আমার আজকের বক্তব্যের বিষয় নয়। কিন্তু তবু, আমি বিষয়টির কয়েকটি দিকের ওপরে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

সমাজগুলো যখন উদগ্র-আধুনিকতার কারণে অধঃপতিত হতে থাকে কিংবা মাথাভারী এবং ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, তখন সেগুলো উল্টো মুখে নিম্নগামী হতে থাকে এবং তাদের প্রেরণা-প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে জান্তব আচরণ প্রত্যাবর্তিত হয়। ব্যাপারটা প্রতিটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে গোচরীভূত না-ও হতে পারে, তবে তা সুখান্বেষণের প্রচেষ্টায় প্রায় সর্বত্রই মানবীয় সম্পর্কের বেলায় এবং আচার আচরণে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিষয়টা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে, যদি আমরা মানুষের যৌন আচরণের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি।

যৌন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে গোটা প্রাণিজগতেই প্রকৃতিদত্ত সুখানুভূতি জড়িত রয়েছে। যে পার্থক্যটা আমরা মানব-সমাজে দেখতে পাই, তা হচ্ছে, অমার্জিত প্রবৃত্তির কেবল নিবৃত্তিকরণ থেকে, জান্তব প্রবৃত্তির তুষ্টি সাধন থেকে, ক্রমাগতভাবে শালীন ও মার্জিত আচরণে উত্তরণ।

প্রকৃতির এটা কোন মতেই কাম্য নয় যে, যৌনবৃত্তিই হোক চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে, সর্ব কালেই বংশবৃদ্ধিকরণ এবং প্রজাতিসমূহের বিস্তার ও সম্প্রসারণ। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা দ্বিতীয়

পর্যায়ের। তবে, সমাজগুলো অধঃপতনের শিকার হয় তখন ব্যাপারটা প্রায় বিপরীত হয়ে যায়।

বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের বা নিয়ম প্রণালীর ক্রমান্বয়ে বিকাশ, এই নিয়ম প্রণালীর সঙ্গে সম্পৃক্ত আচার-অনুষ্ঠান এবং নর-নারীর পারস্পরিক মিলনের রীতি-প্রথা প্রভৃতি, সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমাজের একটা স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ বলে বিবেচিত হতে পারে, এবং বিবেচিত হতে পারে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে। কিন্তু এই বিকাশ ওপর থেকে নির্দেশিত হোক কিংবা তা আপনা থেকে সংঘটিত কোন এলোপাতাড়ি ঘটনাই হোক, এই সত্যটা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, এক্ষেত্রে মৌল প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করার যে সাড়া-প্রক্রিয়া তা ক্রমাগতভাবে ভব্য ও মার্জিত হয়ে উঠেছে।

নারী-পুরুষের অবাধ ও বাছবিচারহীন যৌন সম্ভোগের কারণে সমাজদেহে আবারও সেই একই ব্যাধির লক্ষণসমূহ দেখা দিচ্ছে। যৌন সম্পর্কের প্রতি এটা শুধু একটা গা-সওয়া উদার মনোভাবই নয়, বরং এর মধ্যে, বস্তুতঃ এমন আরও কিছু নিহিত রয়েছে, যা মানবীয় স্বার্থ ও ক্রিয়াকাণ্ডের একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এলাকার গোটা আবহাওয়াটাকেই পাল্টে ফেলে। এরূপ যৌন-সম্পর্কের বৈধতা বা অবৈধতা নিয়ে বিতর্ক করাটাকেও ইদানিং সেকেলে ব্যাপার বলে অবজ্ঞার চোখে দেখা হচ্ছে। অবশ্য, এমন গোড়া ধর্মানুরাগী গোষ্ঠীও আছে, যারা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, বিভিন্ন গণমাধ্যমে, যে কেউ লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, এই সব প্রাচীন-পন্থী কট্টর ধর্মানুরাগী লোকদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

যৌন সম্পর্কে পাশ্চাত্যে এই ধারণা পোষণ করাটা ক্রমান্বয়ে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, যৌন ব্যাপারটা একটা প্রাকৃতিক কামনা বা চাহিদা, এবং তা কোন প্রকার বাধা-নিষেধ ছাড়াই মেটানো উচিত। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কথাবার্তায় যে একটা লজ্জাশীলতা ছিল তা এখন সেকেলে হয়ে গেছে। নগ্নতা, অর্ধ-নগ্নতা, দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন, সম্ভ্রমহীন খোলামেলা আলোচনা, পাপ স্বীকার ও প্রকাশ করা, প্রভৃতি এখন জনসমক্ষে সত্যের প্রকাশ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

কেউ কিন্তু, আর সব প্রাকৃতিক মানবীয় কামনার ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন যুক্তি দেখাতে আসবেন বলে মনে হয় না। এটা কি একটা সাধারণ জৈব কামনা নয়, যা কিনা মানুষের মধ্যেও আছে যে, যার যা কামনা তা-ই সে পেতে চায়? এটাও কি একটা সাধারণ জৈব তাড়না নয় যে, কেউ ক্রুদ্ধ হলে বা উত্তেজিত হলে সে চাইবে, সে যেন তার অন্তরের সেই তাড়নাকে সাধ্যমত হিংস্র উপায়ে প্রকাশ করতে পারে? একটা দুর্বল কুকুর একটা শক্তিশালী কুকুরের মতই উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু শক্তিশালী কুকুরটা যখন কামড়াবে তখন দুর্বল কুকুরটা অন্ততঃ ঘেউ ঘেউ তো করবে।

(চলবে)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো এ প্রসঙ্গে দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

খিলাফতে আহমদীয়া: প্রতিশ্রুত ঐশী খিলাফত ব্যাধিমুক্তির নিশ্চিত নিরাপদ ব্যবস্থা

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

পারস্পরিক যোগাযোগের দিক থেকে সারা পৃথিবী এখন প্রায় একত্রিত হয়ে Global Village-এ রূপ নিয়েছে, আর এমন পরিস্থিতিতে পাপ এবং অপকর্মের সংক্রামক ব্যাধি দূরীভূত করার জন্য আরো বেশি সচেতনতার সাথে চেষ্টা করা উচিত। আত্মরক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি যারা নিয়ে রাখে, চিকিৎসা করিয়ে থাকে, আত্মরক্ষার নিমিত্তে টিকা নিয়ে থাকে, তারা অন্যদের তুলনায় রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় কম নিরাপদও থাকে বেশি।

একইভাবে, আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য সকল পর্যায়ে জাতিগত চেতনা নিয়ে আত্মরক্ষামূলক পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। ভ্রান্তিমুলক বিশ্বাস এবং কর্মের বিকৃতির কারণে, আলেমরা উম্মতের মাঝে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে যে, মুসলমানদের বিরাট এক অংশ শিক্ষা উৎকর্ষ হওয়া সত্ত্বেও আজ ভ্রষ্টতায় নিপতিত। স্থায়ীভাবে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের সংশোধনে অনেক বেশি তৎপরতার সাথে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

তবে এহেন পরিস্থিতিতে মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য মহানবী (সা.) উম্মতকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুয়্যত ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই খিলাফতই প্রতিষ্ঠিত হবে যা নবীরই রীতি-নীতির অনুসরণকারী হবে। এর মাঝে কোন ব্যক্তিস্বার্থ থাকবে না। তা, নবীর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য রাখবে। কিন্তু এক যুগ–কাল কাটানোর পর এই খেলাফত যা সত্য খিলাফত তার অবসান ঘটবে। এই নিয়ামত তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। এরপর এমন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে যা মানুষের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হবে। এরপর, আবার এরও চেয়ে অধিক স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আল্লাহ্ তা'লার করুণা পুণরায় উদ্বেলিত হবে এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুণরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ২৮৫, মুসনাদুন্ নু'মান বিন বাশীর, হাদীস নং: ১৮৫৯৬, আলেমুল কুতুব, বৈরুত-১৯৯৮)

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে মুসলমান রাষ্ট্র প্রধানরা খলীফা হওয়ার দাবি করে সেই মর্যাদা চাইলেও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তাঁর প্রথম চারজন খলীফাকেই খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা দিয়ে থাকে। তাঁদের যুগকেই খিলাফতে রাশেদার যুগ আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ সেই যুগ যা হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং হিদায়াত প্রসারের যুগ ছিল। নিজেদের নিযাম বা ব্যবস্থাপনাকে তারা সেভাবেই পরিচালনা করেছেন যেভাবে মহানবী (সা.)কে তারা দেখেছেন অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী এই ব্যবস্থাপনাকে পরিচালিত করেছেন। বংশগত কোন রাজত্ব ছিল না বরং মু'মিনদের জামাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে খিলাফতের চাঁদর পরিধান করিয়েছেন। কিন্তু তাদেরকে ছাড়া বাকি সেইসব খলীফারা পারিবারিক রাজত্ব-ই চালিয়ে গেছেন। আর মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। প্রথম দু'টো ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী যেহেতু হুবহু পূর্ণ হয়েছে, তাই শেষ যে কথা তিনি বলেছেন সেক্ষেত্রেও আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথাই সত্য প্রমাণিত হওয়া অবধারিত।

মুসলমানদের ইহ-জাগতিকতা এবং অধঃপতিত অবস্থা দেখে সেই খোদা, যিনি মহানবী (সা.)কে চিরস্থায়ী শরীয়ত সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর করুণাসিন্ধুতে ঢেউ উঠে আর নবুওয়তের পদ্ধতিতে পৃথিবীতে তিনি পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা আহমদীরা এই বিশ্বাস রাখি যে, মহানবী (সা.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে আল্লাহ্ তা'লা নিজ করুণাকে উদ্বেলিত করে জাগরুক রেখেছেন।

তাঁর করুণা প্রকাশ পেয়েছে এবং তিনি (আল্লাহ), আমাদের মনিব (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহ্দীর মাধ্যমে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে যেখানে উম্মতি নবী হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন সেখানে তাঁকে 'খাতামুল খোলাফা'র মর্যাদায়ও ভূষিত করেছেন অর্থাৎ এখন মহানবী (সা.)-এর খিলাফতের ধারা তাঁর (সা.) প্রতি নিবেদীত প্রাণ দাস এবং খাতামুল খুলাফার মাধ্যমে সূচীত হয়েছে। অতএব আমরা সৌভাগ্যবান, কেননা নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) আমাদের জন্য করে গেছেন আমরা তা থেকে অংশ লাভকারী উম্মত। আলহামদুলিল্লাহ্!

আহমদীয়া খেলাফতের সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নববী (সা.)

সূরা জুমুআর আয়াত "ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম" (সূরা আল জুমুআ : ০৪)-এর ব্যাখ্যায় তিনি (সা.) পরবর্তীতে আগত যে সকল সৌভাগ্যবানদেরকে পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত করে দিয়েছেন আমরা তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হয়েছি। তাঁর(সা.) যে প্রিয়

সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, পরবর্তীতে আগমণকারী সেই তিনি(আ.) ঈমানকে সুরাইয়্যা নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আবারও ফিরিয়ে আনবেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তাফসীর সূরা আল জুমুআ, বাব ক্বওলুহু ওয়া আখারীনা মিনহুম-হাদীস নম্বর-৪৮৯৭)

আর মহানবী (সা.) তাঁর যে মসীহ্ ও মাহ্দীকে সালাম পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন,এভাবে তিনি আমাদেরকে তাঁর(সা.) সেই প্রতিশ্রুত আগমণকারীর মান্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৮২, মুসনাদ আবি হুরায়রাতা, হাদীস নম্বর-৭৯৫৭, আলেমুল কুতুব বাইরূত-১৯৯৮)

আহমদীয়া জামাতে বয়আতকারী আমাদের ওপরও আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন যে, তাঁর (সা.) তিরোধানের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে চলমান খিলাফতের ধারায় আমরা আজ্ঞাধীন থাকার সৌভাগ্য লাভ করে চলেছি।

মান্যতার দাবি পুরণে আহমদীদের করণীয়

সুতরাং খোদার এ সকল কৃপা প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই দাবি করে যে, খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে সেই পরিবর্তন আনা যা খোদার প্রেরিত সেই মহাপুরুষের মান্যকারীদের জন্য আবশ্যিক বিষয়। তবেই আমরা সেই দাবি পূরণে সক্ষম হব। ঈমানকে সুরাইয়া থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহ্দীর জন্য নির্ধারিত এবং তাঁকে মান্যকারীদের হৃদয়ও তাতে সমৃদ্ধ হওয়ার কথা। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক আহমদী নিশ্চয় এ কথার সাক্ষী যে, এ কাজ সফলভাবে তিনি করে দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করা শুধু তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয় বরং নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার শুভ সংবাদ দেওয়ার পর মহানবী (সা.) যখন নীরব হয়ে যান, সে ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, এই ঈমান কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় সকল মহিমার সাথে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতকারীদের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করে তার জন্য অবশ্য করণীয় হলো সেই ঈমানকে হৃদয়ে গ্রথিত রেখে সবসময় এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।

সেসব মান্যকারীদের জন্য অবশ্য করণীয় হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সেই ঈমানের বহিঃপ্রকাশ-স্থল হয়ে তাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রচার করা এবং তৌহিদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা। আমাদের মনিব ও নেতা আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্যই পাঠিয়েছেন। আর এ কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) নিবেদিত প্রাণ এবং নিষ্ঠাবান দাসকেও পাঠিয়েছেন। এই কাজ সমাধা করার জন্যই মহানবী (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত এই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতকে এ পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায়ের দুঃখজনক সংবাদের পাশাপাশি এ শুভ সংবাদও দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আদি থেকে আল্লাহ্ তা'লার এটিই রীতি যে, তিনি দু'টো কুদরত প্রদর্শন করেন যেন বিরোধীদের দু'টো মিথ্যা উল্লাসকে পদদলিত করে দেখানো হয়। তাই এখন এটি সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আদি রীতি বিসর্জন দেবেন। তিনি বলেন, তোমাদের জন্য যেহেতু দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক এবং তার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয় কেননা তা স্থায়ী, যার ধারা কিয়ামত পর্যন্ত কর্তিত হবে না। (আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, পৃ: ৩০৫)

সুতরাং ঈমানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর এই দ্বিতীয় কুদরতকে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা চান না যে, ধর্মের বিরোধীরা এই অজুহাতে উল্লসিত হোক যে, ধর্ম পুনরায় পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা এটি চান না যে, শয়তান ধৃষ্টতার সাথে যাচ্ছে-তাই করে বেড়াক। বিরোধীদের মিথ্যা উল্লাসকে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই পদতলে পিষ্ট করবেন। তাই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পর চলমান খিলাফতের সমর্থন ও সাহায্যের মাধ্যমে ঈমানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

খিলাফত প্রতিষ্ঠিত রাখতে আত্ম-নিবেদিত থাকা অত্যাবশ্যক

এই ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি যারা করে, তাদের ওপরও আল্লাহ্ তা'লা এই দায়িত্ব বর্তিয়েছেন যে, এই ঈমানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তারা খিলাফতের সাহায্যকারী হোন আর নিজেদের বয়াতের অঙ্গীকারকে সমুন্নত রেখে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হোন যে, আমাদেরকে নিজেদের ঈমানেরও হিফাযত করতে হবে আর অন্যদেরকেও ঈমানের আলোতে আলোকিত করতে হবে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আদি থেকে এটি খোদার রীতি বা সুন্নত যে, তিনি দু'টো কুদরত প্রদর্শন করেন আর আমরা সবাই ভালোভাবে জানি যে, এই দ্বিতীয় কুদরত হলো, খিলাফত ব্যবস্থা বা নিযামে খিলাফত। সুতরাং ধর্মীয় উন্নতির সাথে খিলাফত ব্যবস্থার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে আর ইসলামী শরীয়তের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খিলাফত ছাড়া ধর্মীয় উন্নতি বা ধর্মের উন্নতি সম্ভবই নয়। খিলাফত ছাড়া জামাতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত থাকতেই পারে না। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের প্রত্যেকেই, খিলাফতের সাথে যে-ই সম্পৃক্ত, সে এ কথা খুব ভালোভাবে জানে এবং বুঝে যে, জামাতে খিলাফত চলমান থাকা ঈমানেরই অংশ আর এ কথা তারাও জানতো, যারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর তিরোধানের পর জামাতে নৈরাজ্যবাদীদের কথা প্রত্যাখ্যান করে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চাইতেন। তাদের জানা ছিল যে, আমাদের ঈমান প্রতিষ্ঠিত থাকতেই পারে না যদি আমাদের মাঝে খিলাফত ব্যবস্থা সচল না থাকে।

খোদার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ যে, সেই সকল লোকের কুরবানীর কারণে, তাদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণে আজ আমাদের অনেকেই যারা সে সকল বুযুর্গদের পরবর্তী প্রজন্ম, খিলাফতের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা-সংগ্রাম এবং ত্যাগ-তিতীক্ষা স্বীকার করেছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। অপবাদ

আরোপকারীরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর ওপর অনেক বড় বড় অপবাদ আরোপ করেছে কিন্তু খিলাফত ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য তাঁর হৃদয়ের যে চিত্র ছিল তার একটি ছবি বা চিত্র খলীফাতুল মসীহ্ সানীর ভাষায় নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে, কেননা এটিও ইতিহাসের অংশ আর ফিতনা ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইতিহাসের সেই প্রেক্ষাপটের ওপর আমাদেরও দৃষ্টি রাখা উচিত। একইভাবে ঈমানের দৃঢ়তার জন্য এটি আবশ্যক আর ঈমানের দৃঢ়তার কারণও বটে। (২৯ মে ২০১৫,খুতবা জুমু'আ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)

মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর খিলাফত একটি আলোকজ্জ্বল প্রতিশ্রুত খিলাফত

অতএব, এটি শুধু খিলাফত এবং ব্যবস্থাপনারই প্রশ্ন নয় বরং ধর্মেরও প্রশ্ন। এরপর শুধু খিলাফতেরই প্রশ্ন নয় বরং এমন খিলাফতের প্রশ্ন যা প্রতিশ্রুত খিলাফত। ইলহাম ও ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত।

খিলাফতের একটি ধরন হলো, মানুষের মাধ্যমে খোদা তা'লা খলীফা নির্বাচন করান এবং এরপর তাকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দেন। কিন্তু এটি সেরূপ খিলাফত নয়। তিনি (রা.) নিজের খিলাফত সম্পর্কে বলেন, এটি সেরূপ খিলাফত নয়। অর্থাৎ আমি শুধু এজন্য খলীফা নই যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের মৃত্যুর পরের দিন আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা সমবেত হয়ে আমার খিলাফতের বিষয়ে একমত হয়েছে। বরং আমি এ কারণেও খলীফা যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের খিলাফতেরও পূর্বে খোদা তা'লার ইলহামের আলোকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, আমি খলীফা হব। অতএব, আমি শুধুমাত্র খলীফা নই বরং প্রতিশ্রুত খলীফা। আমি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নই কিন্তু আমার কণ্ঠ খোদা তা'লার কণ্ঠ কেননা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে খোদা তা'লা এর সংবাদ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই খিলাফতের মাকাম বা মর্যাদা মা'মুরিয়াত এবং খিলাফতের মধ্যবর্তী কোন মাকাম বা মর্যাদা। এটি এমন বিষয় নয় যে, আহমদীয়া জামাত একে বৃথা যেতে দিবে আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এটি সফল বিবেচিত হবে। যেভাবে একথা সঠিক যে, নবী প্রতিদিন আসেন না, তদ্রূপ একথাও সঠিক যে, প্রতিশ্রুত খলীফাও প্রতিদিন আসেন না। তাছাড়া 'খোদা তা'লার নবী পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে অমুক কথা আমাদেরকে এভাবে বলেছেন', একথা বলার সুযোগও প্রতিদিন পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিকতা এবং নৈকট্যের যে চেতনা, তা সেই ব্যক্তির হৃদয়েও সৃষ্টি হতে পারে, যে একথা বলার সুযোগ পায় যে, আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট এবং প্রেরিত ব্যক্তি এটি বলেছিল, তা সেই ব্যক্তির হৃদয়ে কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে যে কেবল এটি বলার সুযোগ পায়, আজ থেকে দুই শত বছর পূর্বে খোদা তা'লার প্রেরিত ব্যক্তি অমুক কথা এভাবে বলেছিলেন। কেননা দুইশত বছর পর যে বলবে, সে এর সত্যায়ন করতে পারবে না কিন্তু যে ব্যক্তি'বিশ-ত্রিশ বছর পরে'- এ কথা বলবে সে এর সত্যায়নও করতে পারে। (খুতবাতে শুরা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮-১৯)

সেই সময়, যখন জামাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমার বিরোধী, জামাতের অর্থ ভাণ্ডারও শূন্য, জমা ছিল শুধুমাত্র চৌদ্দ আনা পয়সা। (চৌদ্দ আনার অর্থ, এক রূপিতে ষোল আনা হয় অর্থাৎ পুরো এক রূপিও ছিল না। আর বর্তমান যুগের হিসেবে ৮৭/৮৮ পয়সা।) আঞ্জুমানের কাঁধে ঋণের বোঝা ছিল আঠার হাজার রূপি, আঞ্জুমানের অধিকাংশ সদস্য ছিল আমার বিরোধী, আঞ্জুমানের সেক্রেটারী আমার বিরোধী, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকও আমার বিরোধী আর তখন আমি খোদার ইচ্ছায় সেই বিজ্ঞাপনে এই বাক্য প্রকাশ করেছিলাম, খোদা চান আমার হাতে জামাতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক, খোদার এ ইচ্ছাকে এখন কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। তারা কি দেখে না, তাদের সামনে মাত্র দু'টি পথই খোলা আছে, হয় তারা আমার হাতে বয়আত করে জামাতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে নয়তো কামনা-বাসনার অনুসরণে সেই পবিত্র বাগানকে উপড়ে ফেলুক যাতে পবিত্র লোকেরা রক্তাশ্রু সিঞ্চন করেছেন। পূর্বে যা কিছু হয়েছে তাতো হয়েছেই কিন্তু এখন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জামাতের ঐক্যের একটাই পথ আর তাহলো খোদা তা'লা যাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন তাঁর হাতে বয়আত করা, অন্যথায় এর বিরুদ্ধে যে-ই যাবে সে বিভেদের কারণ হবে। এরপর তিনি বলেন, আমি লিখেছি, জগতের সবাই যদি আমাকে মেনে নেয় তবুও আমার খিলাফত বড় হতে পারে না আর খোদা না করুক সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে তবুও আমার খিলাফতে কোন পার্থক্য আসতে পারে না। যেভাবে নবী একাই নবী হন সেভাবে খলীফাও একাই খলীফা হন।

অতএব, কল্যাণমন্ডিত তারা, যারা খোদার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খোদা তা'লা আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন তা অনেক ভারী আর যদি তাঁর সাহায্য আমার সাথে না থাকে তবে আমি কিছুই করতে পারব না। কিন্তু সেই পবিত্র সত্তার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। মোটকথা, বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা হয়েছে, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অভ্যন্তরীণ এবং বাহিরগতও; কিন্তু জামাতকে উন্নতির মহাসড়কে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। (ম্যাঁয় হি মুসলেহ্ মওউদ কি পেশগুয়ী কা মিসদাক হু, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৯-২২১)

আজ, এ এক জাজ্বল্যমান সত্য যে ৫২ বছরেরও অধিককাল ব্যাপী ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণবর্ষী তাঁর (রা.) খিলাফতকালে ধরাপৃষ্ঠ আশিষমণ্ডিত হয়েছে। কাল-পরিক্রমায় অর্জিত গবেষণালব্ধ জ্ঞান এই বাস্তবতাকে আরও সুস্পষ্ট করবে।

দাজ্জালী ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাপত্র

পথভ্রষ্টতার রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে, "আমাদের প্রণিধান করা উচিত যে, অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রোগ-ব্যাধি দেখা দিয়েছে এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে আর আমরা কীভাবে সেগুলো থেকে রক্ষা পেতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণের পর তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এর ওপর আমল করাও একান্ত আবশ্যক। পরিবর্তিত সামাজিক অবক্ষয়ের স্রোতে নিজেদের গা ভাসিয়ে

দেয়ার প্রয়োজন নেই বরং আমাদের কাজ হল অবস্থাকে নিজেদের শিক্ষা ও আদর্শ-সম্মত করা।

খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা

খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা আবশ্যক। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ এবং জামাতের ওয়েব সাইটও দান করেছেন। আজে-বাজে জিনিস দেখার পরিবর্তে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকাও একান্ত আবশ্যক। কেননা এর মাধ্যমে সত্যিকার কুরআনী শিক্ষা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জ্ঞান এবং তত্ত্ব-সমৃদ্ধ বিষয় সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। এগুলোর মাধ্যমেই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা আমাদের লাভ হয়। তাই এর সাথে সম্পৃক্ত থাকা আমাদের জন্য আবশ্যক।

আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত, কুরআনের মত গ্রন্থ পাওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মাঝে এমনসব ভুল-ভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে যার ফলে বিশেষ রোগ দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই যে বিষয়টি তাদের মাঝে জাতিগত ব্যাধি সৃষ্টি করার সবচেয়ে বড় কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে তাহল, মুসলমানদের আমল-শূণ্য এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, কুরআন শরীফ একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ এবং এতে সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটি মানুষের জন্য হিদায়াতের কারণ।

অতএব, বাহ্যত এ কথাগুলো শুনে এটিই মনে হয় যে, কুরআনের সৌন্দর্য্য এবং বৈশিষ্ট্যকে একপ্রকার ত্রুটি বা দুর্বলতা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে কেননা কুরআন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এগুলো আসলে কুরআনের সৌন্দর্য্যই কিন্তু এটিকে ভুলভাবে বোঝার কারণে অর্থাৎ কুরআনী শিক্ষাকে ভুল বোঝার কারণে মুসলমানদের মাঝে অনেক বড় ব্যাধি দেখা দিয়েছে। এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআন করীম একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, এটি কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল যুগের জন্য হিদায়াত বা হিদায়াতনামা, যাতে সকল প্রকার উৎকর্ষপূর্ণ শিক্ষার সমাহার ঘটেছে। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা যিনি মানব মস্তিষ্কের স্রষ্টা, তিনি একথাও জানতেন যে, মানব মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য হল, যদি এর মাঝে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস সৃষ্টি না করা হয় তাহলে এটি মরে যায় এবং উন্নতি করার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। তাই যদিও তিনি কুরআনকে কামেল এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে নাযিল করেছেন কিন্তু প্রত্যেক আদেশ যা তিনি এর মাঝে দিয়েছেন তার একটা অংশ মানব মস্তিষ্কের চিন্তা-ভাবনার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। কিছু নীতি এমন নির্ধারণ করেছেন যা সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য আর কিছু এমন কথা বা বিষয় রয়েছে যা সম্পর্কে ভাবা এবং প্রণিধান করা আবশ্যক, যেন মানুষ নিজে সন্ধান করতে পারে এবং তার মন-মস্তিষ্ক যেন অকেজো না হয়ে যায়। তাই পবিত্র কুরআন এমন ভাষায় বা এমন বাক্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, এগুলো সম্পর্কে ভাবলে বা প্রণিধান করলে এর তত্ত্বজ্ঞান এবং গভীরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। নতুবা সবাইকে একইভাবে উপকৃত করা যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে কুরআন শরীফে বর্ণিত বিষয় এমন প্রকাশ্য বা সুস্পষ্ট হতো যেন প্রত্যেক ব্যক্তি, তা সে চিন্তা করুক বা না করুক, এসব বিষয় সম্পর্কে সে অবহিত হতো। তাই ঐশী অভিপ্রায় এটিই যে, মানুষের মন-মস্তিষ্ক যেন অকেজো না হয়ে যায় এবং চিন্তা বা প্রণিধান না করার কারণে কোথাও এর উন্নতি এবং বিকাশের ধারা যেন বন্ধ না হয়ে যায়।" (খুতবাতে মাহমুদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ: ৮০)

কিন্তু এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, এরও কিছু নীতি নির্ধারিত আছে। আর এ যুগে সেগুলোর সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে বিভিন্ন নীতি তুলে ধরেছেন। স্পষ্টভাবে তফসীর করে তিনি আমাদের তা দেখিয়েছেন ও বুঝিয়েছেন যা আমাদের সামনে রাখা উচিত এবং এগুলোর সাহায্যে কুরআন শরীফে নিত্য-নতুন নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তথ্য সন্ধান করা উচিত। অন্যান্য মুসলমানের মতো আমরা যদি শুধু পুরনো তফসীর নিয়েই পড়ে থাকি তাহলে সেসব তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারও উন্মোচিত হবে না যার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পথের দিশা দিয়েছেন। আজকাল অ-আহমদীদের মধ্যেও যারা বড় বড় মুফাস্‌সের, ডক্টর ডিগ্রী-ধারী এবং বড় বড় আলেম রয়েছে তারাও আমাদের জামাতের বই-পুস্তক এবং তফসীর পড়ে নিজেদের দরস দেয়। বরং কিছু আলেম এমনও আছে যারা তফসীরে কবীর রীতিমত পাঠ করে। তাই অবশ্যই কুরআন শরীফ একটি কামেল এবং উৎকর্ষ-পূর্ণ আর সম্পূর্ণ গ্রন্থ আর নিঃসন্দেহে এর মাঝে সব কিছুই রয়েছে। কিন্তু এটি পড়ার পর যারা চিন্তা-ভাবনা করে আর এর শিক্ষা মোতাবেক অনুশীলন করে তারাই হিদায়াত পায়। শুধুমাত্র একটি কথা শিখে মনে করা যে, হিদায়াত পেয়ে গেছি এটি যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি শিক্ষার ওপর আমল করা জরুরী। এর মাধ্যমেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত দোষ এবং গুণের কথা জানা যায়। এই গ্রন্থে আখারীনদের শিক্ষার জন্য এবং তাদের চিন্তা-চেতনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য, আলো দেখানোর জন্য এবং পবিত্র কুরআনকে বোঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় এক রসূল প্রেরণের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যারা ভাবে না বা প্রণিধান করে না এবং আলেম আখ্যায়িত হয়েও যারা অজ্ঞ আর খোদার প্রেরিতকে যারা অস্বীকার করে, তারা এই কারণে কুরআনের জ্ঞানের ব্যাপকতা থেকে বঞ্চিত আর অজ্ঞতার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরার পরিবর্তে ইসলামের দুর্নাম করার কারণ হচ্ছে। অতএব, এই সকল মুসলমানের এমন কর্ম আমাদেরকে যেন এ সম্পর্কে আরো বেশি ভাবতে এবং প্রণিধান করতে শিখায় যে, আমরা যেন শুধু বাহ্যিকতাকেই সবকিছু মনে না করি বরং ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত প্রাণকে বুঝে সকল প্রকার পাপকে জাতিগত পাপে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেই যেন দূর করতে পারি আর সকল প্রকার পুণ্যকে জাতিগত পুণ্যে রূপান্তরিত করে পুরো জামাতে যেন তা প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। সবসময় আমরা যেন এমন পরিবেশ উপহার দিতে পারি আর এই শিক্ষাকে যেন পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালন করতে পারি যার কল্যাণে পাপের বিস্তার প্রসার ঘটার পরিবর্তে নেকী এবং পুণ্যের বিস্তার ঘটবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

৫ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণ-প্রিয় নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার সাসকাচিউন প্রদেশের লয়েডস মিনিষ্টারে 'বায়তুল আমান' মসজিদের উদ্বোধন করেন। মসজিদে উপস্থিত হবার পর হুযূর (আই.) এ অনুষ্ঠানটির স্মৃতি রক্ষার্থে একটি ফলক উন্মোচন করেন এবং তারপর এক নীরব দোয়া পরিচালনা করেন। এরপর এ মসজিদে হুযূর (আই.) মাগরিব ও এশা'-র নামাযে ইমামতি করেন। পরের দিন, অর্থাৎ ৬ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে মসজিদটির উদ্বোধনীকে চিহ্নিত করতে বিশেষ এক অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে হুযূর (আই.) মূল-বক্তব্য প্রাদন করেন। তার এ বক্তব্যে হুযূর (আই.) মসজিদ নির্মাণের আসল উদ্দেশ্য কি, তা বর্ণনা করেন এবং নতুন এ মসজিদটি যে কেবল সর্বশক্তিমান খোদার উপাসনারই স্থান নয়, বরং এটা যে সব মানুষের সেবা এবং প্রতিরক্ষারও উপায়, সে বিষয়ে বর্ণনা দান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন যে, এমন এক সময়ও ছিল, যখন ইসলামের ভয় ছিল সর্বব্যাপী। তখনও এটা ছিল খোলা-হৃদয় এবং অসাধারণ সাহসের এক প্রতীক, যাতে অতিথিরা ইসলামী কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারতো। মসজিদ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন ঃ 'মস্ক' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'মসজিদ', আর এর আক্ষরিক-অর্থ হচ্ছে- এমন এক স্থান, যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্-র ইবাদতের জন্যে মানুষ পূর্ণ-নম্রতা ও বিনয় সহকারে একত্রিত হয়। কোন মানুষ যদি এ নম্র ও ভদ্র রূহ্ সহ নিজকে এক অধম বিবেচনা করে কোন মসজিদে প্রবেশ করে, তবে সে অন্যদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করতে পারে না অথবা কোন অমিল কিংবা বিদ্বেষের কারণও হতে পারে না"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "একজন মুসলমান, যে বিনয়ের সাথে তার নামাজ আদায় করে, সে হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যে দয়ালু, যত্নশীল ও করুণাপূর্ণ, এবং যে অনৈতিকতা, বে-আইনী কাজ এবং সব ধরণের পাপ থেকে দূরে অবস্থান করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে। বিশৃঙ্খলা অথবা বিভেদ সৃষ্টি করার বদলে মসজিদগুলো হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার ইবাদতের জন্যে লোকদেরকে অবনমিত অবস্থায় আনার একটি উপায়"। হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা আল মায়েদার ৩ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দান করেন, যাতে বর্ণিত আছে যে, "পবিত্র মসজিদে প্রবেশে বাধা দানের কারণে কোন জনগোষ্ঠীর সাথে সৃষ্ট তোমাদের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমা-লঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযূর (আই.) বলেন ঃ "প্রাথমিক-যুগের সেসব মুসলমান, যারা নির্দয়ভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তাদেরকেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদের সেসব নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কোন জবাব দিতে কিংবা সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন, যদিও তারা তাদেরকে পবিত্র মসজিদ ক্বাবাঘরে, যেটা ইসলামে অতীব পবিত্র স্থান, সেখানে ঢুকতে বাধা প্রদান করেছিল"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "ফলত:, মুসলমাদের জন্যে পবিত্র কুরআন সহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার ও ক্ষমার নজির-বিহীন এক মান স্থাপন করেছে, যা মান্য করা তাদের জন্য জরুরী, যার মধ্যে তারা ন্যায়পরায়ণতা, অনুগ্রহ ও সততার সাথে কাজ করতে বাধ্য, যদিও তারা তেমন ব্যক্তিও হয়, যারা তাদের ধর্মীয়-স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে চায়। অতএব, এটা পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন যে, সত্যিকার মসজিদগুলোকে ভয় পাবার কোন প্রয়োজন নেই, সেসব মসজিদ প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা ঘৃণা প্রদর্শনের কোন স্থান নয় বরং সেগুলো হচ্ছে শান্তি, সমন্বয় এবং ঐক্যের গৃহ, যেগুলোকে কেবলই সর্বশক্তিমান খোদার ইবাদতের জন্যে তেরী করা হয়েছে"।

হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা-র ৩৭নং আয়াতেরও উল্লেখ করেন, যেটা মুসলমানদেরকে তাদের পিতা-মাতা, জ্ঞাতিবর্গ, অনাথ, অভাবীদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের আহ্বান জানায়। এ

আয়াতের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন যে, মুসলমানদের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে সমগ্র মানবজাতিকেই ভালবাসার মাধ্যমে সেবা দান করা, তা সে যে-কোন বর্ণ, গোত্র অথবা ধর্ম-মতেরই হোক না কেন। হুযূর (আই.) বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদগুলো বদান্যতার কুরআনী-রুহ-র প্রতিফলন ঘটায় এবং আমাদের মসজিদগুলো খোদার অধিকার ও বান্দার অধিকার আদায়ের দ্বৈত-উদ্দেশ্য পূরণে এবং মানবজাতির অধিকার পূরণের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে।

হুযূর (আই.) বলেন ঃ "আমাদের মসজিদগুলো নির্মিত হয়েছে মানুষদেরকে একত্রিত করতে এবং আমাদের প্রতিবেশীদের এবং স্থানীয়-সমাজের সেবা করতে। আমাদের মসজিদগুলো হচ্ছে সেই সংকেত-গৃহ, যা শান্তি, ভালবাসা এবং মানবতার আলো বিকিরণ করে। যেখানেই আমরা মসজিদ বানিয়েছি কিংবা আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেছি, সেখানেই স্থানীয়-লোকদের কষ্ট লাঘব করতে চেয়েছি, কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর অধিকার পূরণের কাজটি মানজাতির অধিকার পূরণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আমাদের ধর্ম ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষা দান করে যে, আমাদের ইবাদত এবং আমাদের প্রার্থনগুলো মুল্যহীন, যদি আমরা আমাদের চারপাশে যারা রয়েছে, তাদেরকে ভালবাসতে, সমর্থন করতে এবং লালন-পালন করতে ব্যর্থ হই"।

হুযূর (আই.) আফ্রিকার দাতব্য-প্রচেষ্টাগুলোর উদাহরণ দেন, যেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত পরিস্কার-পানির পাম্প, হাসপাতাল ও স্কুল তৈরী করে পরিস্কার পানীয়-জল এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের লোক-হিতকামী প্রচেষ্টগুলোর ইতিবাচক প্রভাবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "কয়েক ঘন্টা ধরে মাথায় মাটির পাত্র বহন করার বদলে সেসব শিশু এখন সেইসব স্কুলে শিক্ষা লাভ করছে, যেগুলো আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠা করেছে। দারিদ্রের দাসত্ব-বন্ধন থেকে আমার তাদেরকে মুক্ত করতে চাচ্ছি এবং তাদেরকে নিজ পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি, যাতে তারা কেবল তাদের নিজ পরিবারকেই নয়, বরং তাদের জাতিগুলোর সেবা করতে পারে"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "এ ধরনের অসুবিধা-গ্রস্ত লোকদের কাঁধ থেকে হতাশার ভারী-বোঝা অপসারণ করতে পারাকে আমরা আমাদের সৌভাগ্য মনে করি। এটাই হচ্ছে খাঁটি-ইসলাম, যার মধ্যে সর্বশক্তিমান খোদার ইবাদত করার পাশাপাশি মুসলমানরা অন্যদেরকে আরাম দানের আন্তরিক চেষ্টা করে থাকে"।

উপসংহারে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে, স্থানীয় সেসব লোক, যারা মসজিদের পাশে বাস করে, তাদের শীঘ্রই এটা দেখতে আসা উচিত যে, নতুন এ মসজিদটি সমগ্র মানবজাতির জন্যে শান্তির এক কেন্দ্র বলে প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) দোয়া করতে গিয়ে বলেন ঃ "আমি দোয়া করি যে, আমাদের প্রতিবেশীরা এবং বস্তুত সব সদস্যই দেখতে পাবে এবং নিজেরা এ সাক্ষ্য দান করবে যে, এ মসজিদটি হচ্ছে স্থানীয় আহমদী মুসলমানদের পক্ষ থেকে বদান্যতা, যত্ন এবং সুবিবেচনার সর্বোচ্চমানের এক প্রতীক। আর আমি দোয়া করি যে, আমরা যেন কখনো কারো জন্যে ব্যথা অথবা উদ্বেগের কারণ না হই। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, স্থানীয় আহমদীরা এর ওপর কাজ করবেন এবং নিঃস্বার্থভাবে ও খোলা মনে মানবতার সেবা করার প্রয়াস পাবেন"।

মূল-বক্তৃতা প্রদানের আগে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডার প্রেসিডেন্ট জনাব মালিক লাল খান কর্তৃক এক স্বাগত-ভাষণ দান করা হয়, যার পর লয়েড মিনিষ্টারের নির্বাচিত মেয়র মিঃ জেরার্ড আলবার্স তার মন্তব্য প্রদান করতে গিয়ে হুযূর আকদাস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)কে তার শহরে স্বাগত জানান। এরপর আরো ক'জন উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা মঞ্চে আরোহন করে তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। তাদের মধ্যে সাসকাচ্যুন প্রদেশের এম এল এ মিঃ কলিন ইয়ং বলেন ঃ "হুযূর, আপনার পরিচালনাধীন আহমদীয়া মুসলিম জামাত আমাদের এ প্রদেশে এবং আমার নির্বাচনী এলাকায় মানবসেবায় কিভাবে নিয়োজিত আছে, সেটা আমরা দেখি ও অনুভব করি। কানাডায়, বিশেষ করে সাসকচ্যুনে আমরা 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে,–আপনাদের এ দর্শনটি শেয়ার করি"।

সাবেক ফেডারেল মিনিষ্টার অব ইন্টিগ্রেশন ও ডিফেন্স মিঃ জেসন কেনি বলেন ঃ "কানাডার আহমদীয়া মুসলিম জামাত হচ্ছে এমন একটি জামাত, যেটা কানাডীয় বহুত্ববাদের আদর্শের মধ্যে এর ধর্মবিশ্বাস লালনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার এক আদর্শ-জামাত বটে। এ জামাতটি হচ্ছে পুরোপুরি ভাবে মুসলিম এবং পূর্ণভাবেই কানাডীয়, আর তাই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নবাগতদের জন্যে এক বিস্ময়কর উদাহরণও বটে"।

সাবেক রাজনীতিবিদ এবং বর্তমানে সুপরিচিত এক রেডিও টক শো-র হোষ্ট মিঃ জন গর্মলি বলেন ঃ "সাম্প্রদায়িক প্রসারতার দিক থেকে, পৌর/রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার দিক থেকে এবং সমৃদ্ধতর এক কানাডা তৈরী করার ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জাতীয় কার্যক্রমটি হচ্ছে আমাদের জন্যে সম্পূর্ণরূপে এক অনুপ্রেরণার বিষয়"।

সংবর্ধনার আগে ও পরে হুযূর (আই.) বেশ ক'জন অতিথিকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ দান করেন এবং স্থানীয় সংবাদ-মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে এক প্রেস-কনফারেন্স-এ মিলিত হন।

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৬৫)

ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝার কারণ

* "আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি মিথ্যা দাবী করিতাম,নিশ্চয়ই খোদা আমাকে ধ্বংস করিতেন। কিন্তু আমার যাবতীয় ক্রিয়া–কলাপ বস্তুতঃ তাঁহারই নিজস্ব কাজ। আমি তাঁহারই পক্ষ হইতে আসিয়াছি। আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় সেই খোদাকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং স্বয়ং তিনিই আমার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন...।

...ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝার দরুণ যাহারা রূপকের ভাষায় বর্ণিত ব্যাপার প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অবশেষে ভবিষৎদ্বাণীই অস্বীকার করিতে হয়। ইহুদিদিগকে এই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল এবং খৃষ্টানদের এখন এই বিপদ ঘটিতেছে। খৃষ্টীয় চার্চ বা পাদ্রীগণের প্রভাব জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ খৃষ্টান এই প্রভাবকেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন মনে করে। সমুদয় লক্ষণ কখনও জনসাধারণের ধারণা অনুযায়ী পূর্ণ হয় না। এইরূপ হইলে নবীদের সময় মতভেদ হইবে কেন? তাঁহাদিগকে গ্রহন না করিবারই বা হেতু কি ? ইহুদি জাতির নিকট জিজ্ঞাসা কর, মসীহ্ (আঃ) আসিবার যাবতীয় নিদর্শন পূর্ণ হইয়াছে কি? তাহারা বলিবে পূর্ণ হয় নাই। জানিয়া রাখ , এ বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই খোদার কানূন। খোদার কানূনে কখনও কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না (সূরা আহযাব ঃ৬৩)। মানুষের ধারণা এবং মানুষের দেওয়া ব্যাখ্যা বা মানুষের অনুমান সম্পূর্ণরূপে নির্ভূল ও সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইহাতে ভুলের সম্ভবনা থাকে।" [তবলীগে হক পৃঃ ৪৪–৪৫)।

রূপকের দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা হয়ঃ

* "খোদার চিরাচরিত রীতি হলো, প্রায়শঃ তাঁর ভবিষ্যৎ-সংক্রান্ত সংবাদ রূপক কথায় সজ্জিত সূক্ষ্মতত্ত্বে এমন কিছু অনুষঙ্গ থাকে, যার মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে খোদাতা'লার নিয়মের অধীনে এ পরীক্ষার কারণে তাদের রোগ আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা ত্বরা-প্রবণতা বশতঃ খোদার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যবশত সেই ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যাঁকে খোদাতা'লা স্বীয় জ্ঞান দান করেছেন আর খোদার ভয়ে ভীতদের মত চিন্তা করে না। এরপর যখন তাঁর নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত হয় আর তাঁর সত্যতার সমুজ্জ্বল প্রমাণ প্রকাশ পায় তখন তারা হয় অনুশোচনার সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে বা বিদ্বেষের গহ্বরে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় আর তাদের কাছ থেকে খোদা মুখ ফিরিয়ে নেন। কেননা, খোদা বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন। আর যাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়েছে এবং খোদার পক্ষ থেকে আলোকিত করা হয়েছে এমন মানুষ ঐশী জ্ঞান চর্চায় দক্ষতা রাখেন আর প্রকৃত তত্ত্ব চিনেন, খোদার জ্যোতিতে দেখেন আর খোদার নিরাপত্তার ছায়াতলে আশ্রিতদের মত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সৌভাগ্য পান।" (হামামাতুল বুশরা, পৃঃ–১২৩)।

রূপকার্থে খোদার পুত্র হওয়ার তাৎপর্যঃ

* "যখন মানুষ সত্যিকার ভাবে খোদা তা'লাকে ভালবাসে তখন খোদাও তাহাকে ভালবাসেন। তখন পৃথিবীতে তাহার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তৃত করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে তাহার জন্য খাঁটি ভালবাসা সৃষ্টি করা হয়। তাহাকে আকর্ষণ করার শক্তি দান করা হয়। তাহাকে একটি জ্যোতিঃ দান করা হয় যাহা সদা-সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে। যখন একজন মানুষ খাঁটি অন্তঃকরণে খোদাকে ভালবাসে এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর তাঁহাকে প্রাধান্য দেয় ও গায়ের-উল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুর) মহিমা ও প্রতাপ তাহার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে না, বরং সে সকলকে মৃত কীটের চাইতেও অধম মনে করে, তখন খোদা, যিনি তাহার হৃদয় দেখেন তিনি এক ভারী জ্যোতিঃ বিকাশের সহিত তাহার উপর অবতীর্ণ হন। যখন একটি স্বচ্ছ আয়নাকে এমনভাবে সূর্যের বিপরীত দিকে রাখা হয় যে, সূর্যের প্রতিবিম্ব উহার উপর পরিপূর্ণরূপে পতিত হয়, তখন রূপকভাবে বলা যাইতে পারে যে, ঐ সূর্যই যাহা আকাশে আছে তাহা এই আয়ানাতেও বিদ্যমান। অনুরূপভাবেই খোদা এইরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে অবতীর্ণ হন এবং তাহার হৃদয়কে নিজের আরশে (অর্থাৎ গুণাবলীর পবিত্র অবস্থান স্থলে) পরিণত করেন। ইহাই ঐ উদ্দেশ্য যাহার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। পূর্বের ধর্ম গ্রন্থ সমূহে যেখানে পরিপূর্ণ সত্যবাদীগণকে খোদার পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে উহারও এই অর্থ নহে যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই খোদার পুত্র। কেননা , ইহাতো কুফরী।

তিনি পুত্র ও কন্যা হইতে পবিত্র। বরং ইহার অর্থ এই যে, ঐ সকল পরিপূর্ণ সত্যবাদীর স্বচ্ছ আয়নায় খোদা প্রতিবিম্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এক ব্যক্তির প্রতিবিম্ব, যাহা আয়নায় প্রতিফলিত হয়, তাহা রূপক অর্থে যেন তাহার পুত্র। কেননা, যেভাবে পুত্র পিতা হইতে জন্ম লাভ করে ঠিক তদ্রুপই প্রতিবিম্ব নিজের আসল সত্তা হইতে জন্ম লাভ করে। অতএব যখন এইরূপ হৃদয়, যাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয় এবং যাহাতে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে না, তখন ইহাতে আল্লাহতায়ালার জ্যোতির প্রতিফলন ঘটে। এমতাবস্থায় ঐ প্রতিফলিত ছবি রুপক অর্থে আসল সত্তার জন্য পুত্র রুপে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই তাওরাতে বলা হইয়াছে যে, ইয়াকুব আমার পুত্র, বরং জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই অর্থেই ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইঞ্জিলে পুত্র বলা হইয়াছে। খোদার কেতাবসমূহে রূপক অর্থেই ইবরাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, সোলায়মান প্রমুখ নবীকে খোদার পুত্র বলা হইয়াছে।এই সীমা পর্যন্তই খৃষ্টানদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল।" [হকিকাতুল ওহী, পৃঃ ১৩৬]।

"অনুরূপভাবেই ঈসা (আ.)ও তাঁহাদের অন্যতম। এমতাবস্থায় তাঁহার সম্পর্কে কোন আপত্তি উঠিত না। কেননা, যেভাবে রূপক অর্থে এই সকল নবীকে পূর্বের নবীগণের কেতাবে পুত্র-রূপে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেভাবে কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খোদারূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। সত্য কথা এই যে, ঐ সকল নবী খোদার পুত্র নহেন এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খোদা নহেন। বরং এই সকল রূপক ভালবাসার প্রতীক। এইরূপ শব্দ খোদাতা'লার বাক্যে অনেক আছে। যখন মানুষ খোদাতা'লার প্রেমে এইরূপে বিলীন হইয়া যায় যে, তাহার নিজের বলিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই বিলীনতার অবস্থায় এইরূপ শব্দাবলী বলা হইয়া থাকে।

কেননা, এই অবস্থায় মধ্যখানে তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকে না। যেমন, আল্লাহতা'লা বলেন, (সুরা আল যুমারঃ আয়াত ৫৪)ঃ'এই সকল লোককে বল, হে আমার বান্দারা! খোদার দয়া হইতে নিরাশ হইও না। খোদা সকল পাপ ক্ষমা করিবেন।' এখন দেখ এই জায়গায় 'হে আল্লাহর বান্দারা' স্থলে 'হে আমার বান্দারা' বলা হইয়াছে। যদিও মানুষ খোদার বান্দা এবং আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বান্দা নহে। কিন্তু ইহা রূপক অর্থে বলা হইয়াছে।

অনুরূপভাবেই আল্লাহতা'লা বলেন,(সূরা আল ফাতহঃ আয়াত ১১) 'যাহারা তোমার বয়াত করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে খোদার বয়াত করে। ইহা খোদার হাত, যাহা তাঁহার হাতের উপর আছে।' এখন এই সকল আয়াতে আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাতকে খোদার হাত সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকাশিত যে, উহা খোদার হাত নহে। অনুরূপভাবে এক জায়গায় আল্লাহতা'লা বলেন, (সূরা আল বাকারাঃ ২০১) 'তোমরা খোদাকে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতাকে স্মরণ করিয়া থাক।'অতএব এই স্থানে খোদাতা'লাকে পিতার সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত করা হইয়াছে এবং রূপকও কেবল সাদৃশ্যের সীমা পর্যন্ত সীমিত।

অনুরূপভাবে খোদাতা'লা ইহুদীদের দ্বারা বর্ণিত একটি কথাকে শিক্ষারূপে কুরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ কথাটি এই যে, (সূরা আল মায়েদাঃ আয়াত ১৯) 'আমরা খোদার পুত্র এবং তাঁহার প্রিয়।' এই জায়গায় খোদাতা'লা 'পুত্র' শব্দ কি এই বলিয়া বাতিল করেন নাই যে, তোমরা কুফরী কথা বলিতেছ? বরং খোদাতা'লা বলেন, যদি তোমরা খোদার প্রিয় হইয়া থাক তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দেন কেন? উপরন্তু 'পুত্র' শব্দটি দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের কেতাবসমূহে খোদার প্রিয়জনদিগকে পুত্ররূপে সম্বোধন করা হইত।" [হাকিকাতুল ওহী, পৃ–৫৫]

[চলবে]

বিজ্ঞপ্তি

আপনারা অবগত আছেন যে, হুযূর (আই.) ৮৩তম বৎসরের ঘোষণা করেছেন এবং সকল আহমদীকে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং হুযূর (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পত্রে প্রতি বৎসরের ন্যায় এইবারও তাগিদ করেছেন, চাঁদার ওয়াদা যাতে পূর্বের চেয়ে বেশী করা হয় এবং প্রত্যেক জামাত এর অংশগ্রহণকারীর সদস্য সংখ্যা নওমোবাইন সহ ১০০% পূর্ণ হয়। সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।

হুযূর (আই.) এর দপ্তর হতে প্রাপ্ত পত্রে আরও বলা হয়েছে যে জামাতের সদস্যগণ যাতে প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে তাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খরচ হতে কিছু টাকা বাচিয়ে প্রতি মাসে তাহ্‌রীকই জাদীদের চাঁদা প্রদান করেন। অর্থাৎ তাহ্‌রীকই জাদীদের প্রতি মাসে আদায় করার অভ্যাস করতে হবে।

আপনাদের নিকট বিনীত নিবেদন, আসন্ন রমযান মাসে তাহ্‌রীকে জাদীদের চাঁদা অগ্রীম আদায়ের মাধ্যমে ১০০% তাহ্‌রীকে জাদীদ চাঁদা আদায়ে সচেষ্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে এবং উক্ত চাঁদা আদায়কৃত রিপোর্ট আগামী ২৫ রমযানের মধ্যে ন্যাশনাল আমীর এর দপ্তরে পাঠাতে হবে। কেননা প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও তাহ্‌রীকে জাদীদ চাঁদার পরিশোধকারীগণের তালিকা (জামাত ওয়ারি সংখ্যা ও টাকার পরিমাণসহ) হুযূর আকদাস (আই.) এর দপ্তরে দোয়ার জন্য প্রেরণ করা হবে।

সুতরাং আমাদের সকলের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন আমরা আমাদের প্রাণ-প্রিয় হুযূরের দোয়ার বরকতের অংশীদার হতে পারি।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী তাহ্‌রীকে জাদীদ
মোবাইল: ০১৭১৪-০৮৫০৭০/০১৭৩০০২৮৫৭৬

শবে বরাত

মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান, ভারত ও বাংলাদেশে শবে বরাত অত্যন্ত জমকালো ভাবে পালন করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো সউদি আরবে শবে বরাত বলতে কোন অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয় না। ১৫ ই শাবান হলো শবে বরাতের দিন ও রাত হলো শবে বরাত। এ রাত সর্ম্পকে বলা হয়, এ রাতে প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য লিখে দেয়া হয়। তাই এ রাতে অনেক বেশী নামায পড়ে খোদাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। এছাড়া বলা হয়, ১৫ ই শাবান রসূল করীম (সা.) রোযা রাখতেন এবং রাতে কবর যিয়ারত করতেন ও বেশী নওয়াফেল পড়তেন। তাই দিনে রোযা রাখতে হবে এবং রাতে নওয়াফেল পড়তে হবে এবং কবর যিয়ারত করতে হবে। বলা হয় এ রাতে মৃত আত্মারা পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখে যায়। অনেকে বলেন, জান্নাতে একটি গাছ আছে যার পাতাগুলোতে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের নাম লেখা আছে যে পাতাগুলো এ রাতে পড়ে যায়, সে পাতাতে যে সব মানুষের নাম লেখা থাকে তারা এ বছর মারা যাবে। অনেকের মতে এ রাতে মানুষের জীবন ও মৃত্যু সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত হয়। বলা হয় এ রাতে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং বলেন কে আছে যে ক্ষমা চাইবে আর আমি ক্ষমা করবো। কে আছে যে চাইবে আর আমি তাকে দিব।

শবে বরাতে হালুয়া রুটি বানানো হয় এবং আতশবাজী পোড়ানো হয়। এ নিয়ে মুসলিম উম্মতে অনেক মতবেধ আছে। অধিকাংশের মতে এটি বিদাত ও কুরআন ও সুন্নাতে এর কোন ভিত্তি নেই। যারা শবে বরাত উদযাপন করে তাদের মতে কুরআনে এর দলীল আছে। আর তা হলো সূরা দুখানের চার, পাঁচ ও ছয় নম্বর আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে- "আমরা একে নিশ্চয় এক আশিষপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। আমরা (বিপথগামীদের) সর্তক করে থাকি। আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে (এ রাতে) প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নিশ্চয় আমরাই রসূল প্রেরণ করে থাকি।"

তাছাড়া তারা কিছু হাদীসও উপস্থাপন করে থাকেন। প্রায় চৌদ্দটি রেওয়ায়াত শবে বরাতের পক্ষে উপস্থাপন করা হয়। কিছু লোকদের মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে কিবলা পরিবর্তন হয়। আর সে দিনটি ছিল ১৫ ই শাবান। এ জন্য এ দিনটি উদযাপন করা হয়। আজকাল আলেমগণ শবে বরাতকে সূরা দুখানের আয়াতে বর্ণিত **"লায়লাতুন মুবারাকাতুন"** বলে থাকে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে এ রাতের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এ রাত সর্ম্পকে যে ধ্যান ধারনা অনেক মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে, এর কোন প্রমাণ কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসে পাওয়া যায় না। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে তো নয়ই, বরং তাবেঈনদের যুগেও এর কোন নামগন্ধ পাওয়া যায় না। শবে বরাত ইরান থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়েছে। 'শবে বরাত' ফার্সি শব্দটিও এদিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে। আসলে লায়লাতুল কাদর এর ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করলে শবে বরাত হয়। শাবান ইসলামী ক্যালেন্ডারের অষ্টম মাস। এ মাসের ১৫ তারিখ অর্থাৎ ১৫ ই শাবান 'শবে বরাত' বলে পরিচিত। আরবে 'লায়লাতুন নিসফে মিন শাবানা' অর্থাৎ শাবান মাসের অর্ধেক বলে পরিচিত। 'শব' ফারসি শব্দ। এর অর্থ হলো রাত এবং বরাতও ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হলো ভাগ্য। এ শব্দটি কুরআন ও হাদীসের কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। তবে এর বিপরীতে সূরা কদর এ "লায়লাতুল কাদর" শব্দ পাওয়া যায় যা রমযানের সাথে সম্পৃক্ত শাবান মাসের সাথে নয়। সূরা দুখানের যে আয়াতটি শবে বরাত সর্ম্পকে দলীল-রূপে উপস্থাপন করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে এক ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর দলীল। সূরা দুখানের এ আয়াতে বলা হয়েছে- আমরা একে নিশ্চয় এ আশীষপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। এখানে 'হু' অর্থাৎ 'একে' সর্বনামটি কার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে। সব মুফাসসিরগণ এ সর্বনামটি কুরআনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে একমত। এখন প্রশ্ন হলো কুরআন কবে অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে শাবান মাসে না রমযানে? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন, রমযান সেই মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা :১৮৫)

অতএব পবিত্র কুরআন যে রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। উম্মতে মোহাম্মাদীয়া একমত যে, কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে "লায়লাতুন মুবারাকা" শাবান মাসের নয় রমযান মাসের রাত বলে আল্লাহ্ তা'লা নির্ণয় করছেন। যাদের মতে "লায়লাতুন মুবারাকা" শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত, তারাও এ কথাটি মানেন যে, কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন করাই যেতে পারে এমন ভুল ব্যাখ্যা করে তারা মুসলমানদেরকে কেন বিদাতের দিকে

ঠেলে দিল? এর উত্তর আমরা এছাড়া আর কি দিতে পারি "শুধুমাত্র হালুয়া রুটির" জন্য। কারণ সূরা দুখানের এ আয়াতের হালুয়া রুটির সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সূরা দুখানের আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এ রাতে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞতাপূর্ণ ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রকাশ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) , মুজাহিদ, কাতাদা ও হাসান বসরীর মতো প্রখ্যাত তাফসীরকারকগণ "লায়লাতুন মুবারাকা" বলতে "লায়লাতুল কদর"-কে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা কাদর পড়লে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'লা বলছেন, নিশ্চয় আমরা এ কুরআন কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে কদরের রাত কী? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এতে ফিরিশ্‌তারা এং পবিত্রাত্মা সব বিষয়ে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ এক অনাবিল শান্তি। আর এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত বিরাজ করে।

অতএব 'শবে বরাত' বা 'লায়লাতুল মুবারাকা"হলো লায়লাতুল কদর তা কুরআন থেকেই প্রমাণিত হয়। আর এটিও সুস্পষ্ট কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার। ১৫ই শাবানের রাতের উল্লেখ কুরআনে নেই প্রমাণিত হলো। তফসীরকারকদের নীতি "কুরআনের একাংশ আরেকাংশের ব্যাখ্যা করে দেয়" তাও প্রমাণ করে দিল "লায়লাতুল মুবারাকা" আসলে "লায়লাতুল কাদর"।

এখন প্রশ্ন ওঠে, এ রাতে মৃত্যু অথবা ভাগ্য নির্ধারিত হয় অথবা মৃত আত্মীয়স্বজনদের আত্মা পৃথিবীতে আসে এসব কি? এর উত্তর হলো কুরআনে ও হাদীসে এর কোন উল্লেখ নেই। "লায়লাতুল কাদর" এর সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলোতে এর কোন উল্লেখ নেই। একটু চিন্তা করলেই বলা যায় এ সব কিছু মনগড়া কথা। মৃত্যু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ মরতে পারে না। কেননা এর জন্য এক মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)।

তিনি আরও বলেন, তিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন। আর গর্ভাশয়ে যা-ই আছে তিনি তা জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং (এটাও) কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে। (সূরা লুকমান : ৩৪)

সূরা হিজরের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আর নিশ্চয়ই আমরাই জীবিত করি ও আমরাই মৃত্যু দেই। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান তাই করেন। " (সূরা হাজ্জ : ১৫) এছাড়া আরো বহু আয়াত রয়েছে যা থেকে জানা যায় মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয়াদী আল্লাহ্ তা'লা শাবানের ১৫ তারিখ নির্ধারণ করেন না বরং এই তকদীর বা পরিমাপ আল্লাহ্‌র হাতে এবং এটা তিনি লায়লাতুল কাদরের রাতেও তা নির্ধারণ করেন না। এ মেয়াদ জন্ম হতেই নির্ধারিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা সবকিছু এক পরিমাপে সৃষ্টি করেছি। আর আমাদের আদেশ চোখের পলক ফেলার ন্যায় এক নিমিষেই (কার্যকর হয়)। (সূরা কামার : ৫০)

তবে মানুষের আমল, দোয়া ও খোদার নৈকট্য প্রাপ্তির কারণে এ তকদীর দীর্ঘায়িত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর যা (বা যে) মানুষের উপকার করে তা (বা সে) পৃথিবীতে স্থায়ী হয়। (সুরা রাআদ ১৭) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে যারা ঈমান এনেছা! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া সেভাবেই অবলম্বন কর যেভাবে তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। আর তোমরা কখনো আত্মসমর্পনকারী না হয়ে মরো না। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

মৃত্যু যদি "লায়লাতুল মুবারাকাতে" নির্ধারিত হয় তবে এ আয়াতের কি অর্থ করবেন? ইসলাম তো কর্মের কথা বলে যা প্রতিনিয়ত করতে হয়। এ নয় যে একদিন বা এক রাতে ইবাদত কর, আর প্রয়োজন নেই। তৌহিদ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তাকওয়া, দানখয়রাত এক রাত বা একদিনের ব্যাপার নয়। এ এক নিয়মিত কর্ম। যদি এক রাতেই বছরের সব কিছু নির্ধারিত হয় তবেএক রাতের পর সারা বছর ইবাদত আর আমলের কোন প্রয়োজন থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি বল, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী। " (সূরা আয যুমার: ৫৪) এ আয়াত খোদার ক্ষমার দ্বার এক রাতের জন্য নয় বরং প্রতিটি মুহূর্তের জন্য খুলে দিয়েছে। প্রকৃত তওবা করলে যেকোন দিন, যেকোন রাত, যেকোন মূহুর্তে সে খোদার কৃপার অধিকারী হতে পারে। তাই খোদার সিদ্ধান্ত বান্দার আমলের কারণে হয়। আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত আমল করলে পরে হয় আমল করার আগে নয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি যে কল্যাণই লাভ কর তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে এবং তোমার যে অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের কারণেই হয়। (সূরা নিসা : ৮০) উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতগুলো এ বিষয়টি পরিষ্কার করে সারা বছরের জন্য তকদীর নির্ধারিত হওয়া 'শবে বরাত' বা 'লায়লাতুল কদরে'-র সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইসলামে কর্ম হলো এক চলমান প্রক্রিয়া যা জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত করে যেতে হবে। হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই হযরত রসূলে করিম (সা.) "আইয়্যামুল বীজ" অর্থাৎ আলোকিত দিনগুলোতে প্রতি মাসে রোযা রাখতেন। আর এ দিনগুলো হলো প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। এ সম্পর্কে বুখারী, নাসাঈ ও মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে সহীহ্ রেওয়াত রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি স্পষ্ট যে হযরত রসূলে করীম (সা.) শুধুমাত্র শাবানের ১৫ তারিখে রোযা রাখেন নি বরং প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রেখেছেন। তাই প্রমাণিত হলো ১৫ ই শাবান অর্থাৎ শবে বরাত বলে যা চালানো হচ্ছে বিশেষ করে এর সাথে শবে বরাত নামক দিনের রোযার কোন সম্পর্ক নেই। তবে রেওয়াত হতে জানা যায় শাবান মাসে হযরত নবী করীম (সা.) অনেক বেশি রোযা রাখতেন । এর ব্যাখ্যায় অনেক কিছু বলা যায়। তবে রমযানের প্রস্তুতি হিসেবে যে এ রোযাগুলো রাখতেন এতে

অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন একমত। দ্বিতীয়ত হযরত নবী করীম (সা.) প্রায়শই দাউদী রোযা রাখতেন। আর এ নফল রোযা হলো এক দিন পর পর রাখা। বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযা ছিল উত্তম- যিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। জানা উচিত এ হলো নফল রোযা।

তথাকথিত শবে বরাতের পক্ষে ১৪ টি হাদীস উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। মুহাদ্দেসীন ও আসমাউর রেযালের (অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সততা, স্মরণশক্তি ইত্যাদি নির্ণয়করণ) পুস্তকাদীতে এসব রেওয়ায়েতকে "যয়ীফ" (দূর্বল) এবং "মাওযূ" (বানানো) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ সব হাদীসের এক বর্ণনাকারী "ইবনে আবি যাবারাহ" এর ওপর "মাওযূ" হাদীসের অপবাদ রয়েছে। হাদীসের আসমাউর রেযালের ওপর হযরত ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর পুস্তক "তাকরীব"-এর ৩৯৬ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ আছে। আসমাউর রেযালের ওপর বিখ্যাত পুস্তক "মীযানুল ই'তেদাল"-এতে হযরত ইমাম বুখারীর বরাতে শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীস সমূহের সনদের কয়েকজন বর্ণনাকারীকে "যয়ীফ" দুর্বল বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। সুতরাং ১৫ ই শাবান সর্ম্পকে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মূল কথা হলো যার উল্লেখ কুরআনে নেই এবং সুন্নাহ ও আসার থেকে সাব্যস্ত নয় তা কি ভাবে ইসলামের অংশ হতে পারে ? বলা হয়ে থাকে ১৫ ই শাবানের রাতে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হয়ে বান্দাদের ক্ষমা করার ঘোষণা দেন, দান করার ঘোষণা দেন ইত্যাদী। জেনে রাখা উচিত এরূপ হাদীস শুধুমাত্র ১৫ ই শাবানের জন্য নির্ধারিত নয়। বরং আহাদীসে বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেক রাতে যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পার হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা দেন কে আছে যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দিব.....। এছাড়া রমযানের ফযিলত সর্ম্পকে আমরা সবাই জানি। এ মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। রমযানের প্রথম ১০ দিন রহমতের দিন, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফেরাতে দিন আর শেষ ১০ দিন নাজাতের। আবার এর মেধ্য শেষ দশকের বেজোড় রাতে "লায়লাতুল কাদর"ও আছে। অতএব ১৫ই শাবানের রাত সর্ম্পকে যা কিছু বলা হয় তা হাদীস হতে প্রমাণিত সত্য নয়। বরং এর তুলনায় রমযানের প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত এবং লায়লাতুল কাদর যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এর গুরুত্ব অনেক বেশী এবং হযরত নবী করীম (সা.)উম্মতের দৃষ্টি জোরালোভাবে এদিকে আকর্ষণ করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনে এরকম রাত বহুবার এসেছে কিন্তু মহানবী (সা.) নিজে কখনো এ রাতকে বিশেষভাবে উদযাপন করেন নাই আর না-ই তিনি (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন যে এটিই একমাত্র বিশেষ রাত, এ রাতে বিশেষভাবে ইবাদত কর তাহলে তোমাদের ভাগ্য ভালো হবে এবং তোমরা সফল হবে। এর বিপরীতে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে চেষ্টাসাধনা করে নিশ্চয় আমরা তাদেরকে আমাদের পথে তাদের পরিচালিত করবো। (আনকাবুত ৬৯)।

মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবা ও তাঁর উম্মতকে অবিরাম ও চলমান চেষ্টাসাধনার শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং নিজেও আজীবন তা করে তাঁর উম্মতের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন। ইসলামে কোন সংক্ষিপ্ত পথ নাই। চলমান এক চেষ্টা প্রচেষ্টা রয়েছে যার ফলদাতা মালেকে ইয়াওমিদ্দীন। সবকিছুই কর্মের উপর নির্ভরশীল। যুগ ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) শাবান মাসের এ রাত সম্পর্কে বলেন," এসব রীতি নীতি ও হালওয়া রুটি বিদআত" (মালফুযাত, নবম খন্ড,২৯৭ পৃ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বলেন," শবে বরাত উদযাপন, গিয়ারহুয়ী শরীফ, কুল খানী ইত্যাদী যা বর্তমানে চালু আছে, এসবের ইসলামের শরীয়ত হতে প্রমাণিত নয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কে প্রশ্ন করা হলো, শবে বরাতের দিন হালওয়া রুটি তৈরি করা কি আহমদীদের জন্য বৈধ? তিনি (রা.) উত্তর দিলেন, " না, এটি বিদআত।" (আল ফযল, ৩০ শে এপ্রিল ১৯৫৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কে প্রশ্ন করা হয়, "মহানবী (সা.) এর জীবন হতে এ রাত সম্পর্কে কি জানা যায়, তিনি (সা.) কি এরাতে অন্যান্য রাতের তুলনায় বেশী ইবাদত করতেন?" তিনি (রাহে.) উত্তরে বলেন , আমি মহানবী (সা.) এর ইবাদত সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়তে দেখেছি। সেগুলোতে কোন বিশেষ রাতের ইবাদতের কথা উল্লেখ নাই। বরং (জীবনের) অনেকরাত সারা সারা রাত দাড়িয়ে ইবাদত করার কারণে পা ফুলে যাবার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এটাই মহানবী (সা.)-এর সুন্নত ছিল। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী সারা রাত দাড়িয়ে ইবাদত করতে না পারলে এর উপর নুন্যতম আমল হলো প্রতিরাতে শেষ রাতে উঠে কিছু ইবাদত করা।" (আল ফযল, ২০ শে জানুয়ারী, ২০০১।

অতএব হালুয়া রুটি এবং আতশবাজীর সাথে হযরত নবী করীম (সা.) এর দুরতম সম্পর্ক নেই। এটি এক বিদআত। আজ যারা ইসলামের নামে এসব করছে কুরআনের এ আয়াত তাদের জন্য সর্তকবাণী উচ্চারণ করছে এবং আমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করছে। আল্লাহ বলেন, " আর নিশ্চয় তাদের মাঝে এমনও একদল আছে যারা কিতাবের বেলায় স্বরকে (এমনভাবে) বদলায় যেন তোমরা তা কিতাবের অংশ মনে কর অথচ তা অংশ নয়। আর তারা বলে, এ হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। অথচ এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে। " (সূরা আলে ইমরান : ৭৯)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সব ধরণের বিদআত থেকে মুক্ত রাখুন। (আমীন)

রোযা প্রসঙ্গ

মাহমুদ আহমদ সুমন, মোয়াল্লেম

বর্ষ পরিক্রমায় প্রতি বছর মুসলিম উম্মাহর দরজায় আত্মসংযম, আত্মোপলব্ধি, তাক্ওয়া এবং মহান কুরবানীর শিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হয় পবিত্র রমযান মাস। পবিত্র মাহে রমযান আধ্যাত্মিক ভূবনে বসন্তের সমারোহে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্ম-শুদ্ধির মাস, পরম করুণাময় আল্লাহ্‌কে একান্ত করে পাওয়ার মাস। এই পবিত্র মাসের পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন–'মানুষ যত কাজ করে তা তার নিজের জন্য আর রোযা রাখা হয় কেবল আমার জন্য। সুতরাং আমি নিজেই এর পুরস্কার বা আমি নিজে এর পুরস্কার দিব। তাই বিষয়টা গভীর ভাবে ভাবা উচিত, যার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্ নিজে। আমরা আল্লাহ্‌কে যাদি পেয়ে যাই তাহলে আর কোন কিছুর কি প্রয়োজন রয়েছে? রোযার ইতিহাস তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

রোযার প্রাথমিক ইতিহাস :

রোযার প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কোন কিছু জানা যায় না। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত দার্শনিক স্পেন্সার নিজের বই Principles of Sociology -তে কতগুলো বন্য সম্প্রদায়ের উদাহরণ এবং জীব বৃত্তান্তের ওপর গবেষণা করে লিখেছেন যে, রোযার প্রাথমিক মানদন্ড এভাবেই হয়তো হয়ে থাকবে যে আদিম বন্য যুগের মানুষ স্বভাবতঃই ক্ষুৎ-পিপাসায় আক্রান্ত থাকতো এবং তারা মনে করতো যে, আমাদের আহার্য বস্তু আমাদের পরিবর্তে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃতদের নিকট পৌঁছে যায়। কিন্তু অনুমানসিদ্ধ উপাত্তকে যুক্তি ও বুদ্ধির আওতাভুক্ত লোকেরা কখনো স্বীকার করে নেয় নি। (ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ঃ ১০ম খন্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা একাদশ সংস্করণ) মোট কথা অংশীবাদী ধর্মমতগুলোতে রোযার প্রারম্ভ এবং হাকীকতের যে কোন কারণেই হোক না কেন ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রাথমিক পর্যায় ও শেষ পর্যায়কে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে নিজের অনুসারীদের ওকালতির প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না। ইসলামের মূল উৎস কুরআন করীমে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে যারা ঈমান এনেছ তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে করে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৪)

অপর এক আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, "রমযান মাস হচ্ছে সেই মাস যার মাঝে কুরআন করীম নাযেল করা হয়েছে। যা মানুষের জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত, পথ প্রদর্শনের দলিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে এই মাসকে পাবে তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। আর যদি কেউ রুগ্ন হয় অথবা সফরে থাকে তাহলে সে সমপরিমাণ রোযা অন্যান্য দিনসমূহে আদায় করবে। আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এইজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)।

এই পবিত্র আয়াতসমূহে শুধু কেবল রোযার কতিপয় আহ্কামই বর্ণনা করা হয়নি; বরং রোযার ইতিহাস, রোযার হাকীকত, রমযানের বিশেষত্ব এবং রোযার প্রতি আরোপিত অভিযোগসমূহের প্রত্যুত্তরসমূহ বিস্তারিতভাবে এবং চিত্তাকর্ষকরূপে বিবৃত করা হয়েছে।

রোযার ধর্মীয় ইতিহাস :

কুরআন করীমের উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের সুস্পষ্টভাবে এই কথা তুলে ধরা হয়েছে যে, বর্তমান ইসলামের সাথেই শুধু কেবল রোযার সম্পৃক্ততা সুনির্দিষ্ট নয়, বরং কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পূববর্তী মাযহাবগুলোতেও রোযাকে একটি ধর্মের বিশেষ অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অন্ধকার যুগের আরবদের সামনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসের মাঝে রোযা অবশ্যই ফরজ ইবাদত হিসেবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু তৎকালিন আরবের বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায় এমনকি বর্তমান যুগের কোন কোন পন্ডিত ব্যক্তিরাও মনে করে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর দাবী যদি সর্বাংশে সত্য ও যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হয় তাহলে এ কথা মেনে নিতে দ্বিধা সংকোচের অবকাশ মোটেই থাকবে না যে, তিনি উপাদানভিত্তিক জ্ঞানবত্তার উর্দ্ধ ও পরিমন্ডলে অবশ্যই অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে ইউরোপের অধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করছি যা অনুসন্ধানীদের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবে। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার রোযার প্রবন্ধ লেখক উল্লেখ করেছেন যে,

"রোযার বিধি-বিধান ও আদায় পদ্ধতি, আবহাওয়া, সামাজিক ব্যবস্থা এবং সভ্যতা বিবর্তনের দরুন যদিও বিভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হয় তথাপি আমরা অতি কষ্টে এমন কোন ধর্মের নাম উপস্থাপন করতে পারব না, যেখানে রোযাকে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করা হয়নি.....বস্তুতঃ রোযা একটি ধর্মীয় প্রথা হিসেবে সকল স্থানে স্বীকৃত আছে"।

ভারতবর্ষকে ধর্ম বিকাশের সবচেয়ে পুরাতন স্থান হিসেবে দাবী করা হয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বর্ত বা ব্রত অর্থাৎ রোযা থেকে এখানকার ধর্মগুলোও বিমুক্ত ছিল না। ভারতীয় বর্ষপঞ্জিতে প্রতিমাসের ১১ ও ১২ তারিখে ব্রাহ্মণদের ওপর একাদশীয় রোযা অপরিহার্য ছিল। এই হিসেব অনুসারে বার মাসে সর্বমোট ২৪টি রোযা পাওয়া যায়। কোন কোন ব্রাহ্মণ কার্তিক মাসে প্রত্যেক সোমবারে রোযা ব্রত পালন করে। হিন্দু যোগীরা চিল্লা পালন করে অর্থাৎ তারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত পানাহার বর্জন করে উপোস থাকার প্রচেষ্টা চালায়। ভারতবর্ষের সকল ধর্মমতে বিশেষ করে জৈন ধর্মের মাঝে রোযা পালনের শর্তাবলী অত্যন্ত কঠিন। তাদের মতানুসারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটি রোযা প্রলম্বিত হয়। গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যে প্রতি বছর জৈন ধর্মের অনুসারীরা কয়েক সপ্তাহ যাবৎ রোযা ব্রত পালন করে। প্রাচীন মিশরীয়দের মঝেও রোযাকে অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। গ্রীক ধর্মানুসারীদের মাঝে শুধু কেবল মহিলারা 'থাসমো ফেরিয়া-এর তৃতীয় তারিখে রোযা রাখতো। পার্শিয়ান ধর্মে যদিও সাধারণ অনুসারীদের ওপর রোযা ফরজ নয় কিন্তু তাদের ইলহামি কিতাবের একটি শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদের ওপর রোযার হুকুম প্রযোজ্য ছিল। বিশেষ করে ধর্মীয় নেতাদের জন্য পাঁচ বছর রোযা রাখা আবশ্যক ছিল। (ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ঃ ১০ম খন্ড, ১৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা, একাদাশ সংস্করণ)

ইহুদীদের মাঝেও রোযা ছিল আল্লাহ্‌র আরোপিত ফরজ ইবাদত। হযরত মূসা (আ.) কুহে তুরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। (নির্গমন ঃ ৩৪-৩৮) সুতরাং সাধারণভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের মাঝে চল্লিশ রোযা রাখাকে উত্তম বলে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু তাদের ওপর চল্লিশতম দিনে রোযা রাখা ফরজ বা তাদের সপ্তম মাসের (তাশরিন) দশম তারিখ পড়ত। (তৌরাত ঃ সফরুল আহবার ঃ ১৬-২৯-৩৪ ঃ ২৩-২৭) এজন্য এই দশম দিনকে আশুরা বলা হতো। আর আশুরার এই দিনটি ছিল ঐ দিন যেদিন হযরত মূসা (আ.)কে তৌরাতের ১০ আহকাম দান করা হয়েছিল। এইজন্য তৌরাত কিতাবে এই দিনের রোযাকে পালন করার প্রতি জোর তাগিদ করা হয়েছে।

বস্তুতঃ উপরোল্লিখিত দিক-নির্দেশনা ছাড়া ইহুদীদের অন্যান্য ছহীফাসমূহের মাঝে অন্যান্য দিনের রোযার হুকুম-আহকামও বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়।

রোযার হাকীকত ও গুরুত্ব :

মানুষের সকল প্রকার আত্মিক অবনতি ও দুর্ভাগ্যসমূহকে এবং তার অসফলতার কার্যকারণসমূহ যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে সর্বশেষ পরিণাম ফল এই দাঁড়াবে যে, পৃথিবীর বুকে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজন সমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী এবং তারা বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে চলে। তাদের অন্তরের যে কোন অনুকম্পন এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তুত যাবতীয় চেষ্টা ও তদবীর কোন প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য থেকে খালি নয়। নৈতিক অবস্থা যা সার্বিক সম্পর্ক আত্মিক অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি এর তাহকীক করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এর ভিত্তিও সাধারণত কোন না কোন প্রয়োজন অথবা গরজে নফসানীর উপর অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য আমাদের সকল প্রকার দূর্ভাগ্য, অপবিত্রতা এ সকল কারণেরই ফলশ্রুতি মাত্র। সুতরাং প্রয়োজন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি মানুষের সংস্পর্শে থেকে বহু দূরে চলে যায় এমনকি এগুলোর ছোঁয়া হতে মানুষ যদি সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী ও বিমুক্ত হয়ে যায় তাহলে সে আর মানুষ রূপে বিবেচিত হবে না, বরং তাকে ফেরেশ্‌তা বলাই সমীচীন হবে।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, মানুষের প্রয়োজনসমূহ এবং তাদের বিভিন্নমুখী আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা একটি বৃহত্তর পরিসরে সীমাহীনরূপে পরিদৃষ্ট হয় এগুলোর আসল হাকীকত কি? আমাদের অন্তরে রয়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি খনি এবং ইচ্ছা ও অভিব্যক্তির সুবিশাল প্রান্তর এবং সেখানে অবস্থান করছে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অসংখ্য প্রয়োজনীয়তার অগণিত সম্ভার। এইসব অগণিত আশা আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর কথা মত চলাই আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য। আমরা যদি খোদা তাআলার হুকুম মতে চলি তাহলেই তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবো আর রোযা হচ্ছে খোদাকে পাবার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযার হাকীকত সম্বন্ধে বলেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশ্‌ফী তাকত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না যে অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশীকোপ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ রাখতে হবে যে, রোযার অর্থ শুধু এটা নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার যিকর অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। আঁ হযরত (সা.) রমযান শরীফে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এদিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ (তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্) করা চাই। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্য দৈহিক শক্তি লাভ হয়, একই ভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং এতে আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার নিকট সাফল্য চাও। কারণ, তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে"। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, "কেবল অভুক্ত ও পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতায়

বুঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মাঝেই এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায় ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং কাশফী তাকত বা দিব্য-দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারের সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। খোদা তাআলার যিকর বা স্মরণেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে। এটা আত্মার প্রশান্তির এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যই রোযা রাখে এবং আচার-অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না তার উচিত, যে সর্বদা হাম্‌দ (প্রশংসা কীর্তন), তসবীহ্‌ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মাহাত্ম ঘোষণা) এবং তাহলীলের (আল্লাহ্‌র তৌহীদ ঘোষণা) মাঝে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়"। (আল হাকাম, ১৭-০১-১৯০৭)

রোযার গুরুত্ব সম্পর্কে রেওয়ায়েত আছে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিষের জন্য নির্দিষ্ট দরজা থাকে, ইবাদতের দরজা রোযা" (জামেউস সাগীর)। তারপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "রোযা ঢালস্বরূপ এবং আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি নিরাপদ দূর্গ" (মুসনাদ আহমদ)। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেছেন, আমরা হযরত ওমর (রা.) নিকট বসেছিলাম, হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, ফেৎনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্পর্কে তোমাদের কাছে আঁ হযরত (সা.)-এর দেয়া কোন বক্তব্য আছে? আমি বললাম, আঁ হযরত (সা.) যা বলেছিলেন আমার তা হুবহু মনে আছে। হযরত ওমর বললেন, 'তুমি কথা বলার ব্যাপারে খুব সাহস রাখ। আমি বললাম, মানুষ তার ঘর-সংসার, ধন-সম্পদ, সন্তানাদী অথাবা প্রতিবেশির পক্ষ থেকে যেসব ফেৎনার সম্মুখীন হয়, নামায, রোযা, সদকা, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে ঐসব ফেৎনার প্রায়শ্চিত্য হয়ে যায়' (বুখারী)।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন ঃ "নিশ্চয় জান্নাতে বালাখানা থাকবে .....যার ভেতরের সবকিছু বাইরে থেকে দেখা যাবে। একজন বেদুঈন দাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ঐ বালাখানা কাদের জন্য হবে? আঁ হযরত (সা.) বললেন, যারা মিষ্টভাষী হবে, অভাবীদের আহার করাবে, রাতের গভীরে যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে তখন যারা নামায পড়ে" (তিরমিযী)।

হযরত আবু মাসুদ গাফফারী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন আঁ হযরত (সা.)কে বলতে শুনেছি তখন রমযান মাস ছিল, হুযূর (সা.) বলেছিলেন, যদি মানুষ রমযানের মর্যাদা, ফযিলত সম্পর্কে জানত তাহলে আমার উম্মতের সবাই আকাঙ্ক্ষা করতো যে সারা বছরটাই যেন রমযান হয়ে থাকে। একথা শুনে বনী খুজাআ গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি রমযানের ফযিলত সম্পর্কে বলুন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত রমযানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। রমযানের প্রথম দিন আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র আরশের নিচে বায়ু প্রবাহ শুরু হয়ে যায়।

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা.) রেওয়ায়াত করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "রমযান মাসে আল্লাহ্‌র যিকর যারা করেন তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, এ মাসে আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে কেউ বঞ্চিত থাকে না"। আঁ হযরত (সা.) এ কথাও বলেছেন, "রোযাদার ব্যক্তি ইফতারী করার সময় যা দোয়া করে তা কখনোই না মঞ্জুর হয় না" (ইবনে মাজাহ)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আওওয়াল (রা.) বলেছেন ঃ "যদি মানুষে জিজ্ঞেস করে যে, রোযার দ্বারা কিভাবে নৈকট্য লাভ হয়! তুমি বল, আমি খুব নিকটে এবং এ মাসে যারা দোয়া করে তাদের দোয়া শুনে থাকি। তাদের উচিত তারা যেন আগের থেকে আমার আদেশ নিশেধ মেনে চলে যা আমি আদেশ দিয়ে রেখেছি। আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যেন সে উদ্দেশ্য লাভে সফল হতে পারে এবং এভাবে সে অনেক উন্নতি করবে" (আল হাকাম, ১৭ নভেম্বর, ১৯০৭)।

তিনি (রা.) আরো বলেন, "রোযা যেমন তাক্‌ওয়া লাভের মাধ্যম তেমনই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভেরও মাধ্যম। তাইতো রমযানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন ঃ (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭) এ আয়াতে রমযানের বরকত সম্পর্কে নাযেল হয়েছে। এখান থেকে রমযান মাসের সম্মান এবং আল্লাহ্‌ সম্পর্কে জানা যায় যে, যদি কেউ এ মাসে দোয়া করে তাহলে আমি কবুল করবো। কিন্তু তার উচিত আমার কথা মেনে চলা এবং মান্য করা। মানুষ যত বেশি আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে শক্তি ব্যয় করে আল্লাহ্‌ ও তত বেশি তার দোয়া কবুল করেন। তারপর আয়াত শেষে যে বলা হয়েছে, "যেন তারা হেদায়াত পায়"–এর থেকে জানা যায় যে, হেদায়ত লাভ করাও এ মাসের বরকত। এ মাসে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য এবং দোয়ার মাধ্যমে হেদায়াত লাভ হয় এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়" (আল হাকাম, ২৪ জানুয়ারী ১৯০৪)।

আল্লাহ্‌ তাআলা রোযাদারের মুখের গন্ধকে এজন্য পছন্দ করেন যে তাঁর বান্দা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে রোযা রাখতে বাধ্য করেছে এবং ইবাদতে রত হয়েছে। ফলে আল্লাহ্‌ তাঁর এমন বান্দাকে খুব পছন্দ করেন। এমন বান্দাদের জন্য বিশেষ রহমত ও ফযলের বাতাস প্রবাহিত করেন। ইহজগতেও তাকে নিজের আশ্রয়ে রাখেন এবং পরকালেও জান্নাতের উত্তরাধিকারী করেন।

আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন, আমরা যেন সঠিকভাবে এই পবিত্র রমযান ইবাদতগুজারে অতিবাহিত করতে পারি। হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে এ রমযানের সীমাহীন কল্যাণ প্রদান কর। প্রত্যেক অনিষ্ট, মন্দ থেকে বাঁচাও, তোমার রহমতের ও ফযলের আবরণের মধ্যে চিরদিন আবৃত করে রাখ।

(আমীন)

সংবাদ

বিভিন্ন জামাতে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

জামালপুর (হবিগঞ্জ, সিলেট)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর হবিগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ০৪.০৪.২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার মসজিদে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বাদ আসর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সীরাতুন নবী (সা.) প্রোগ্রাম চলতে থাকে। সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান চৌধুরী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন শফিক আহমদ চৌধুরী। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। অতঃপর উর্দু নযম পেশ করেন ইমরান আহমদ। সীরাতুন নবী (সা.) জলসার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, মোয়াল্লেম, জামালপুর, হবিগঞ্জ জামাত। এরপর একটি বাংলা নযম পেশ করেন মাওলানা রুহুল আমীন রিয়ন, মুরব্বী সিলসিলা। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব নাবিদ আহমদ লিমন, মুরব্বী সিলসিলা। এরপর একটি আরবী কাসিদা পাঠ করেন জনাব খালিদ আহমদ চৌধুরী। ইসলামের ফেরকাবাজী ও আহমদীয়াত সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম ও জোনাল ইনচার্জ-সিলেট জোন। অতঃপর সভাপতি স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠান শেষে এক মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তর সভায় মাওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, মাওলানা রুহুল আমীন রিয়ন, মৌ. আমীর হোসেন ও মৌ. হুমায়ুন কবির সাহেব জেরে তবলীগ বন্ধুদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় ৪৭ জন জেরে তবলীগ, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারসহ ২০ জন মেহমান এবং স্থানীয় জামাতের সদস্য ৭৩ জন। সর্বমোট ১৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাবুল আহমদ চৌধুরী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ০৮-০৪-২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত এবং অনুবাদ পড়ে শোনান তাহমিনা ফয়েজ (মিতু)। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরমা মাসুদা পারভেজ প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, নরায়ণগঞ্জ। হাদীস থেকে পাঠ করেন মোহতরমা নুররাত জাহান মুন্নি। হুযূরের খুতবা পড়ে শোনান মোহতরমা খাওলাদীন উপমা। অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্ব সীরাতুন নবী (সা.) এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন সেলিনা তবশীর রুবি, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। দোয়া সম্পর্কিত আলোচনা করেন মোহতরমা মাসুদা পারভেজ এবং তবলীগ এর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মোহতরমা মাসুমা শামীম। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরমা সেলিনা তবশীর রুবী। অনুষ্ঠানে ৬৯ জন লাজনা, ১২ জন নাসেরাত, ১৩ জন শিশু ও ২৮ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

সুরাইয়া নাসির তুলি

আনসারুল্লাহ্ ও খোদ্দামুল আহমদীয়া নারায়ণগঞ্জ

গত ২৭/০২/২০১৭ তারিখ বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন সুন্দরভাবে আয়োজন করে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ও খোদ্দামুল আহমদীয়া নারায়ণগঞ্জ, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব কাউছার আহমদ ভূঞা, উর্দু নযম পেশ করেন জনাব তৌফিক আহমদ, তারপর বক্তৃতা করেন তাহের আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা, তার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বিশ্ব নবী (সা.) এর সত্তায় আরোপিত আপত্তির খন্ডন'। এরপর বক্তৃতা করেন মোহতরম ফজল মাহমুদ, আমীর, নারায়নগঞ্জ। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বিভিন্ন ধর্মে হযরত মুহাম্মদ (সা.)', বাংলা নযম পেশ করেন জনাব ফখরুল ইসলাম সেতু। তারপর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিত পাঠ করে শুনান ডাঃ মুজাফ্ফর উদ্দিন আহমদ, সেক্রেটারী তবলীগ ও নায়েব আমীর-২ নারায়ণগঞ্জ। ১ ঘন্টা প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে দোয়া পরিচালনা করান স্থানীয় আমীর মোহতরম ফজল মাহমুদ। উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় মোট ১৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ মুজাফ্ফর উদ্দিন আহমদ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জামাত ও হালকায় মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়

নারায়ণগঞ্জ

গত ২৪/০৩/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের আমীর ফজল মাহমুদ সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ ভুঁইয়া, দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় জামাতের আমীর সাহেব। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। অত:পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রসূল প্রেমের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব ডাঃ মুজাফ্ফর উদ্দিন আহমদ, নায়েব আমীর-২। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ আহমদী-এর ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব শামীম আহমেদ। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমনের সময়-এর ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব এনামুর রহমান আফ্রাদ, বাংলা নযম পাঠ করেন সাকিব আহমদ তাপস, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ-এর ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব তাহের আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা। সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম ফজল মাহমুদ। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন স্থানীয় জামাতের আমীর সাহেব। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৭ জন মেহমানসহ মোট ২১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামীম আহমদ

আখাউড়া

গত ২৪ মার্চ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত আখাউড়ার উদ্যোগে বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। এতে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ মোহাম্মদ ভুইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব সিরাজ উদ্দিন নঈম খাদেম, যয়ীমে আলা, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আখাউড়া। উর্দু নযম পাঠ করেন মেসবাহ উদ্দিন খাদেম, এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জনাব ফালাহ উদ্দিন চৌধুরী, আসাদুজ্জামান নয়ন এবং মৌলবি মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এতে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সালেহ মোহাম্মদ ভুইয়া

বানিয়াজান

গত ২৪/০৩/২০১৭ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ হতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বানিয়াজানের উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আবুল হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল বারেক, মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব। সবশেষে ২৩ মার্চ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন মোহাম্মদ রুহুল বারী, মুরব্বী সিলসিলাহ। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা. বানিয়াজান

বৈরাগীর চর

গত ২৩ মার্চ বাদ যোহর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদী জামাতের বৈরাগির চর হালকার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল হান্নান, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদী। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন সাগর আহমদ, নযম পাঠ করেন মোহাইমিনুর রহমান (নাফি)। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মৌ. ইসমত উল্লাহ্ মিয়াজী। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব হাদীকুল ইসলাম। এরপর বাংলা নযম পাঠ করেন সিয়াম আহমদ ত্রিফল। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। এতে প্রায় ২৫ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

ইসমত উল্লাহ্ মিয়াজী

পাবনা

গত ২৫/০৩/২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা পাবনাস্থ শালগড়িয়ায় মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া সাহেবের বাসগৃহে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র

জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুস সত্তার শেখ। অনুষ্ঠানটি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ জাবিহুল্লাহ সাহেব। অতঃপর প্রেসিডেন্ট সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে ৪০ জন পুণ্যাত্মার বয়আত গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয় তা পাঠ করে শোনান। এরপর বক্তব্য রাখেন হাফেজ মোহাম্মদ জাবিহুল্লাহ ও গোলাম কিবরিয়া। অতঃপর সভাপতি সাহেব যথাসময়ে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মান্য করে আমরা ধন্য-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার শেখ

ডোহান্ডা

গত ২৪/০৩/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব জামিল আহমদ ও নযম পাঠ করেন জনাব সাব্বির আহমদ। এরপর বক্তৃতা পাঠ করেন জনাব মৌ. শামীম আহমদ আব্দুল কুদ্দুস। তার বক্তৃতায় মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সবশেষে দোয়র মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৫ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিল।

শামীম আহমদ

ফতুল্লা

গত ২৪-৩-২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব আমান উল্লাহ্ প্রধান সজল এবং নযম পাঠ করেন জনাব মাসরূর আহমদ তানভীর। ২৩ মার্চ এর পটভূমির ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব নূর আহমদ বিপ্লব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব কাজী মোবাশ্বের আহমদ এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দয়াশীলতার ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব নাবিদ আহমদ। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের লক্ষণাবলীর ওপর বক্তব্য রাখেন ডা: আবু নাসির সাহেব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও আহমদীয়া জামাতের ধর্মবিশ্বাস এর ওপর বক্তব্য রাখেন, মাওলানা খালেদ মুসনাদ খান, মুরব্বী সিলসিলাহ। অতঃপর সভাপতির বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুর রহমান সাহেব, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা। এরপর সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সামাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৭ জন অ-আহমদী ভ্রাতাসহ মোট ৬৭ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, ফতুল্লা

বীরগাঁও

গত ২৩ মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বীরগাঁও-এর উদ্যোগে নামায মাগরিব ও এশা জমা আদায়ের পর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব কামাল উদ্দিন সাহেবের বাড়িতে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজেই। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন নও-মোবাইন সদস্য মাওলানা ওয়াজিদ আলী। পরে উর্দু নযম অনুবাদসহ পরিবেশন করেন নাসেরাত নাফিসা ও লামিশা। বক্তৃতা পর্বে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন জনাব জানে আলম, জেলা নাযেম আনসারুল্লাহ্। আগত অতিথি হাফেজ আবুল বাহার শুভেচ্ছা বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর নও-মোবাঈন সদস্য মাওলানা ওয়াজিদ আলী আহমদীয়া জামাতের অবদান তুলে ধরেন। সবশেষে খাকসার মুহাম্মদ আমীর হোসেন উক্ত দিবসের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরি। এরপর সভাপতি সাহেব তার আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন। খাকসার ইজতেমায়ী দোয়া পড়াই। ৭ জন মেহমান, ২ জন নও মোবাঈনসহ মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমীর হোসেন

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে আমাদের ২য় ছেলে মোহাম্মদ নাহিদ আহমদ, ২০১৬ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে GPA-5 (Golden) এবং ট্যালেন্টপুল-এ বৃত্তি লাভ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। সে পঞ্চগড় বি.পি. সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়-এর ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির জন্য জামাতের সকল ভাই বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
ও **মোসা: নূরে জান্নাত**

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমত ও কৃপার ফলে আমাদের একমাত্র মেয়ে সামিয়া ফারজানা মুন এ বৎসর এস. এস. সি পরীক্ষায় মাইলষ্টোন স্কুল এন্ড কলেজ উত্তরা হতে G.P.A-5 (Golden) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। জামাতের সকলের নিকট তার স্বাস্থ্য কামনা এবং ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

দোয়াপ্রার্থী
ফেরদৌস আহমদ
ও **সেলিনা ফেরদৌস**

বিভিন্ন স্থানীয় জামাতে নও-মোবাইন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

কেরালকাতা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ২৪ মার্চ ২০১৭, তারিখ শুক্রবার ১দিন ব্যাপী আঞ্চলিক নও-মোবাইন সম্মেলন রঘুনাথপুরবাগ জামাতের কেরালকাতায় নবনির্মিত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। রঘুনাথপুরবাগ, বলিয়ানপুর ও সুন্দরবন জামাতের নও-মোবাইন (নতুন আহমদী) সদস্য ও সদস্যাদের তরবীয়তি প্রশিক্ষণের জন্য এই ক্লাসের আয়োজন করাহয়। ন্যাশনাল এডিশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত ও ওয়াকফে জাদীদ নও-মোবাইন আবু জাকির আহমদ সম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত ক্লাসে ৫৮ জন নও-মোবাইন ও ৫ জন জেরে তবলীগ সহ মোট ৮৩ জন প্রশিক্ষণে অংগ্রহণ করেন। নও-মোবাইনের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আবু জাকির আহমদ সাহেব। দিনব্যাপী এই তরবিয়তী প্রশিক্ষণ ক্লাসে অংশগ্রহণকারী নও-মোবাইনগণ তাদের পরিচিতি তুলে ধরেন। ব্যক্তিগত পরিচয় পর্বে নও-মোবাইনগণ তারা কিভাবে আহমদীয়া জামাতের সাথে পরিচিত হলেন এবং বয়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাতের আকর্ষণীয় দিক সমূহের বর্ণনা করেন। উপস্থিত নও-মোবাই সকলেই আহমদীয়া জামাতে দাখিল হওয়ার মাধ্যমে তারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং নিজ পরিবারে আহমদীয়াতের পালনীয় কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন ও নিজ গন্ডিতে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছানোর অঙ্গিকার করেন। রঘুনাথপুরবাগ অঞ্চলের আঞ্চলিক তবলীগ আহ্বায়ক মাওলানা এস এম মাহমুদুল হক সমন্বয়ে এই তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। মাওলানা খোরশেদ আলম, মুরুব্বী সিলসিলাহ ও খালিদ হোসেন সবুজ, মুরুব্বী সিলসিলাহ সহ বক্তাগণ আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও তাদের দোয়া কবুলিয়তের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এছাড়াও আর্থিক কুরবানীর ফজিলত এবং নেযামের আনুগত্যের ফজিলত বর্ণনা করা হয়। নও-মোবাইনগণকে আহমদীয়া মসজিদে নিয়মিত জুমুআর নামায আদায় এবং এমটিএ-এর মাধ্যমে যুগ খলীফার খুতবা সরাসরি শ্রবণের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামায আদায়, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ইসলামী শিক্ষানুযায়ী পারিবারিক জীবনযাপন ও পতযোগে খলীফার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়।

আবু জাকির আহমদ

পাথরঘাটা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ২৫ মার্চ ২০১৭, তারিখ শনিবার ১দিন ব্যাপী আঞ্চলিক নও-মোবাইন সম্মেলন সুন্দরবন জামাতের পাথ ঘাটায় নবনির্মিত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ক্লাসে ২০ জন নও-মোবাইন ও ১৩ জন জেরে তবলীগ সহ মোট ৬৪ জন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। আগত মেহমানদের মধ্য থেকে ১ জন বয়আত গ্রহণ করেন।

আবু জাকির আহমদ

চট্টগ্রাম

গত ১৯ মার্চ-২০১৭ ইং: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম বাদ মাগরিব মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উপস্থিতিতে একটি নও-মোবাঈন সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট পুরুষ মহিলা- ৩০ জন জেরে তবলীগ মেহমান-০৫ জন সর্বমোট= ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। বাদ মাগরিব হতে রাত ৯.৪০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। প্রত্যেক নও-মোবাঈন নিজের পরিচয় বয়াতের প্রেক্ষাপট নিজ ভাষায় বর্ননা করেন। প্রায় সকলের বয়াতের ঘটনাই ছিল ঈমান উদ্দীপক। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব নও-মোবাঈনগনের বক্তব্যের মাঝে মাঝে জামাতী দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া নও-মোবাঈনগনের নিকট থেকে প্রশ্নের আলোকেও অনেক কিছু জেনে নেন। সমাবেশে মোহতরম মাহবুবুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ, স্থানীয় আমীর আলহাজ্ব নেছার আহমদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়। রাতে সমাবেশে যোগদানকারী সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

হাসেম আহমদ

বীরগাও জামাতে ৭দিন ব্যাপী তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৫/০২/২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার থেকে ০৩/০৩/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার পর্যন্ত খোদা তা'লার ফযলে বীরগাও জামাতে ৭ দিন ব্যাপী আতফাল ও নাসেরাতদের নিয়ে তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন শিক্ষা, নামায শিক্ষা, অর্থসহ নামাজ মুখস্থকরণ, বিভিন্ন দোয়াসমূহ ও নযম শিখানো হয়। উক্ত ৭ দিনের ক্লাস পরিচালনা করেন জনাব কামাল উদ্দিন সাহেব, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বীরগাও এবং সহযোগী হিসেবে পরিচালনা করেন রুহুল আমীন রিওন, মুরব্বী সিলসিলাহ।

কামাল উদ্দিন, প্রেসিডেন্ট

আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ ও লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার সম্মিলিত বার্ষিক বনভোজন সম্পন্ন

গত ১১ মার্চ আনসার উল্লাহ্ বাংলাদেশ এর সাথে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার বার্ষিক বনভোজন ২০১৭ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ বছর আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ঢাকা জামাতের লাজনাদের সাথে তেজগাঁও জামাত, মাদারটেক জামাত ও আশকোনা জামাতের লাজনারাও যোগ দিয়েছিলেন। PHA ভবন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। সকঅ ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন আনন্দ আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আলাদা ভাবে লাজনা ও নাসেরাতদের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খেলাধূলার পর পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। যোহর আসর নামায জমা এবং খাবারের বিরতির পর হাতের তৈরী খাবার ও বিভিন্ন ধরনের জিনিস পত্রের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র ছিল। এবার লাজনা ও নাসেরাতদের পুরস্কারের পাশাপাশি উপস্থিত সবচেয়ে প্রবীণ তিনজন লাজনার মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রদর্শনীতে জিনিসের উত্তম মানের ভিত্তিতে সেরা তিনটি প্রদর্শনীকেও পুরস্কৃত করা হয়। উক্ত বনভোজন অনুষ্ঠানে লাজনা ছিল ১৬০ জন, নাসেরাত ৪৫ জন এবং মেহমান ৭ জন মোট উপস্থিত ছিল ২৩৪ জন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

শাহজাদী রোকেয়া

গাজীপুরে ২৬ মার্চ বিজয় দিবস উদযাপন

গত ২৬/০৩/২০১৭ তারিখ বিজয় দিবস-২০১৭ অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাজীপুর জামাতে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল বেলা স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী সাহেব পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। এবং ২৬শে মার্চের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এরপর দেশের শান্তি, ইসলামী মূল্যবোধ, এবং নিরাপত্তা, জঙ্গিবাদ নির্মূলের জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে মোনাজাত করা হয়, মোনাজাত পরিচালনা করেন জনাব কামরুল ইসলাম প্রধান, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। এরপর খোদ্দামুল আহমদীয়া গাজীপুর এর সদস্যরা ওয়াকারে আমল করেন এবং বিকালে ক্রিকেট খেলার আয়োজন করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দেশের এবং ধর্মের বেশী বেশী খেদমত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রধান

মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুর এর উদ্দ্যোগে নিয়মিত মাসিক বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত

আল্লাহ তা'লার অশেষ ফজলে মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুর-এর উদ্যোগে নিয়মিত মাসিক বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মিরপুর মসজিদে এই বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অনুষ্ঠিত বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযে ২০ জন আনসার সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। হাজিরা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নিজ পরিবারের সাথে প্রতিদিন অন্তত: এক ওয়াক্ত বা-জামাত নামায আদায় এবং এমটিএ-তে সরাসরি প্রচারিত যুগ খলিফার (আই.) জুমুআর খুতবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে শ্রবণ করার জন্য ঘরে ঘরে যোগাযোগ করে তাগিদ প্রদান করা হচ্ছে।

আবু জাকির আহমদ, মিরপুর

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, খাকসারের পিতা মুসী আলহাজ্জ আবুল বাশার মোল্লা ০৯/০১/২০১৭ ইং সৌদি আরবে দিবাগত রাতে স্বাভাবিকভাবে আনুমানিক ৫৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন) এবং ২৭/০২/২০১৭ ইং রোজ সোমবার খাকসারের পিতাকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কবরস্থানের ওসিয়্যত এর জায়গায় দাফন করা হয়। ১৭/০৩/২০১৭ ইং বকশী বাজার দারুত তবলীগ মসজিদে মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান সাহেব মেবাল্লেগ ইনচার্জ জুমুআর খুৎবার পরে কিছুক্ষণ উনার যিকরে খায়ের করে গায়েবানা জানাযা নামাজ পড়ান। তিনি ২০০৬ সালে বয়আত করেন এবং যুগ খলীফার তাহরীকে ২০০৮ সালে ওসিয়্যত করেন, ওসিয়্যত নং - ০০০৭৭১৩৫।

আমাদেরকে খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে দেওয়ার কারণে পিতাকে পৈত্রিক গোষ্ঠী, সম্পত্তি এবং মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে চলে আসতে হয় । এমনকি পিতার মৃতদেহটি পর্যন্ত আমার নন-আহমদী দাদা-দাদী দেখতে আসেন নাই। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ছেলে, ১মেয়ে ও ২জন ওয়াকফেনও নাতি-নাতনী রেখে যান। পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার মাধ্যমে জামা'তের সকল সদস্যের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি আল্লাহতা'লা যেন খাকসারের পিতার রূহের মাগফেরাত দান করে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মকাম দান করেন (আমীন)।

মেহেদী হাসান পায়েল

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন

হুযূর(আই.)-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের খুতবার আলোকে প্রস্তুতকৃত

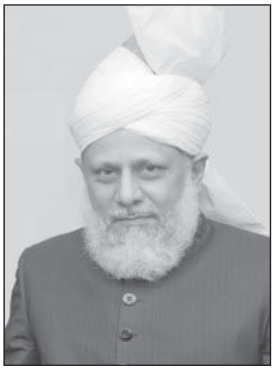

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)

১। আমরা কি বয়াতের ১০টি শর্ত গত বছর যথাযথভাবে পালন করেছি?

২। আমরা কি শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পেরেছি?

৩। আমরা কি লৌকিকতামুক্ত আমল করতে পেরেছি? অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য নয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য কাজ করতে পেরেছি?

৪। আমরা কি প্রবৃত্তির সুপ্ত লালসা ও বাসনামুক্ত আমল করতে পেরেছি?

৫। আমাদের নামায, রোযা ও সদকা-খয়রাত ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, মানবসেবার যাবতীয় কাজ বা ঐশী জামাতের কাজে প্রদত্ত সময় কি কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছিল? নাকি এসব নিছক লৌকিকতা এবং মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা করেছি?

৬। আমাদের মনের সব সুপ্ত-বাসনা খোদাপ্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো?

৭। গত বছরটি আমরা কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা পরিহার করে এবং সত্যে অবিচল থেকে অতিক্রান্ত করেছি?

৮। আমরা কি নিজের ক্ষতিসাধন করে হলেও সর্বাবস্থায় সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করতে পেরেছি?

৯। মনের মাঝে নোংরা ও অশ্লিল চিন্তাধারার উদ্রেক করে– আমরা কি নিজেদেরকে এমন সব আয়োজন ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছি?

১০। টিভি, ইন্টারনেটে পরিবেশিত অথবা এমনসব অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো দেখলে অন্তরে নোংরা চিন্তাধারা জন্ম নেয় আমরা কি এসব পরিহার করতে পেরেছি? (যদি এর উত্তর 'না' হলে আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ)

১১। আমরা কি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বা করে চলেছি?

১২। আমরা কি বিগত বছরে দুষ্কর্ম ও পাপাচারের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি? [উল্লেখ্য, মহানবী(সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়াও দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা বলে গণ্য।]

১৩। আমরা কি নিজ নিজ গণ্ডিতে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচারের পথ পরিহার করতে পেরেছি?

১৪। আমরা কি সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

১৫। আমরা কি সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি? [চরম দুরাচারী এবং পর-নিন্দুক ও পরচর্চাকারীকেও মহানবী(সা.) নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়েছেন।]

১৬। আমরা কি সব ধরনের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি?

১৭। আমরা কি গত বছর নিজেদেরকে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি? (সর্বস্তরে অশ্লীলতা ও সর্বগ্রাসী নগ্নতার এ যুগে রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করাও একটি জিহাদ।)

১৮। আমরা কি গত বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে আদায় করতে পেরেছি? (কেননা নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।)

১৯। আমরা কি বিগত বছরে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট ছিলাম? [মহানবী(সা.) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট থেকো, কেননা এটি খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈকট্যলাভের উত্তম পন্থা এবং এর অভ্যাস মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পাপমোচন করে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে এটি রক্ষা করে।]

২০। আমরা কি হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জন্য নিয়মিত বিনা ব্যতিক্রমে দরুদ পাঠ করেছি ও এখনও করে যাচ্ছি? (বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ আদেশ আর দোয়া গৃহীত হবার একটি কার্যকর মাধ্যম।)

২১। আমরা কি নিয়মিত ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২২। আমরা কি নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২৩। আপন-পর নির্বিশেষে যে কাজ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেয়– আমরা কি এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি?

২৪। আমাদের কথায় বা কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়– আমরা কি এমনভাবে বছরটি কাটিয়েছি?

২৫। আমরা কি মানুষের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনাসূলভ আচরণ করতে পেরেছি?

২৬। বিগত বছরে বিনয় ও নম্রতা কি আমাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল?

২৭। সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে বা বিপদে– সর্বাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি?

২৮। বিপদাপদের সময় আমরা আল্লাহকে অভিযুক্ত করে ফেলি নি তো?

২৯। সামাজিক কদাচার ও প্রবৃত্তির মোহ থেকে আমরা কি নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি?

৩০। আমরা কি কুরআন শরীফ ও মুহাম্মদ(সা.)-এর নির্দেশাবলী ষোল আনা পালনে সচেষ্ট ছিলাম?

৩১। আমরা কি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পেরেছি?

৩২। আমরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি? (কেননা শিরকের পর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হল সবচেয়ে বড় আত্মিক পাপ।)

৩৩। গত বছরটিতে আমরা কি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছি?

৩৪। আমরা কি সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতার বৈশিষ্ট অবলম্বন করতে সচেষ্ট থেকেছি?

৩৫। গত বছরের প্রতিটি দিন কি আমরা ধর্মসেবায় এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছি?

৩৬। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করে থাকি তা সারশূন্য বা বুলি সর্বস্ব নয় তো?

৩৭। আমরা কি ধর্ম সেবাকে নিজেদের ধন-সম্পদের ওপর স্থান দিতে পেরেছি?

৩৮। আমরা কি ধর্মকে নিজ মান-সম্ভ্রমের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে পেরেছি?

৩৯। আমরা কি ধর্মকে নিজ সন্তানদের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করতে পেরেছি?

৪০। আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলাম?

৪১। আমরা কি আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে সচেষ্ট ছিলাম?

৪২। আমরা কি নিজেদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৩। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৪। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সাথে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ও আনুগত্যের সম্পর্ককে আমরা কি ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যার তুলনায় জগতের সকল সম্পর্ক তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়?

৪৫। আমরা কি গত বছর আহমদীয়া খেলাফতের সাথে নিবিড় ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি?

৪৬। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে আহমদীয়া খেলাফতের সাথে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি? আর এদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবার জন্য কি দোয়া করেছি?

৪৭। আমরা কি যুগ-খলীফা ও এ জামা'তের জন্য নিয়মিত দোয়া করেছি?

প্রকাশনায়: আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

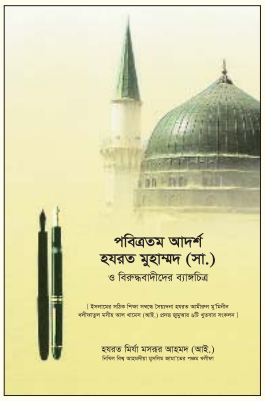

আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ রীতি অনুযায়ী আলো এবং সত্য সর্বদা জয়যুক্ত হয়ে থাকে। যারা অহংকারী এবং দাম্ভিক লোক, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলদের বিরোধীতা করে ঠিকই কিন্তু পরিণতিতে খোদার ক্রোধভাজন হয়। একইভাবে, আজও কতক মানুষ এমন রয়েছে, যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধীতায় মত্ত আছে। আল্লাহ্‌র সুন্নত অনুযায়ী তাদের পরিণতিও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনই কতক মানুষ বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ২০০৬ সালে তাদের পত্র-পত্রিকায় মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র মূলক কিছু কার্টুন আঁকে।

২০০৬ সালের ঐ ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মীর্যা মসরূর আহমদ (আই.) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর শান তথা মর্যাদার উপর একাধারে ৫টি খুতবা প্রদান করেন। উক্ত খুতবাগুলি তিনি ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০, ১৭, ২৪ এবং মার্চ মাসের ০৩ ও ১০ তারিখে প্রদান করা হয়। খুতবার এ বইটিকে সমৃদ্ধ করার মানসে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর আরো ১টি খুতবা সংযোজন করা হলো।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে উক্ত বইটি সংগ্রহ করে তা পাঠ করার জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি আকুল আহ্বান জানাচ্ছি।

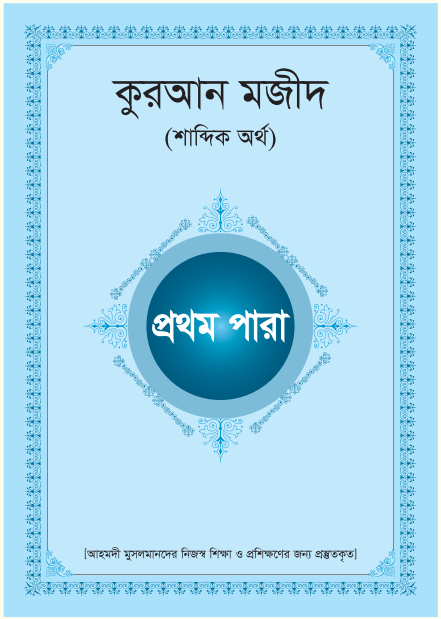

বর্তমান যুগে আমাদের নিকট পবিত্র কুরআন কেবল বাহ্যিকভাবে মূল্যবান বলে পরিগণিত হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই কুরআনের ভিতরে লুক্কায়িত মণি-মুক্তা আহরণের চেষ্টাই করে না। এ কারণে কুরআন মজীদের অর্থ পরিপূর্ণভাবে বুঝার স্বার্থে এই প্রথম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অনুবাদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হল। আশা করি জামা'তের সকলেই এ থেকে উপকৃত হবেন।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে এটি সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নি যেন এটি অধ্যয়ন করেন, সে আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক **"আহমদী"** পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে বিনীতভাবে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী জুলাই ২০১৭ থেকে আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা ৭৫০ টাকা অর্থাৎ ৩ বছরের অধিক বকেয়া রয়েছে তাদের পত্রিকা আর সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। অতএব নিজ-নিজ গ্রাহক চাঁদা অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান জানানো হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯, ০১৭৯৮-০৪০৪৫৮,
০১৭১৭-৯৯৭৩০৬

বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ করুন

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

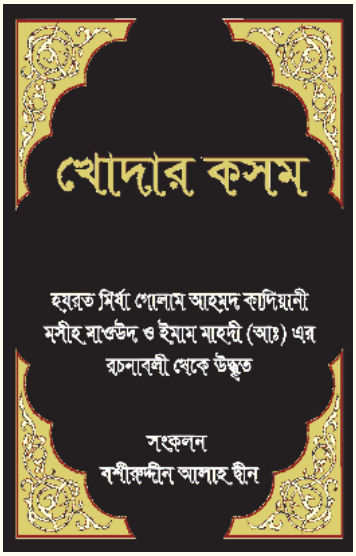

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃত একটি সংকলন 'খোদার কসম' নামক বইটিতে তিনি (আ.) খোদার নামে কসম খেয়ে তাঁর সত্যতার প্রমাণের জন্য যে কথা বলেছেন তা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটি পড়লে একজন পাঠক স্পষ্টতঃ এটি বুঝতে পারে যে, একজন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হলে কখনো এভাবে খোদার নামে কসম খেয়ে এমন প্রতাপান্বিত কথা বলতে পারে না। ভারতের প্রখ্যাত বশীরুদ্দীন আলাহ দ্বীন সাহেব এ বইটি সংকলন করেন। বর্তমানে বাংলা ভাষাতেও এটি পাওয়া যাচ্ছে। তবলীগের জন্য উপযোগী উক্ত বইটি সংগ্রহ করে তা পাঠ করার জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 79 | 21st Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th May, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com